পলাশ-বন

[গার্হস্থ্য-চিত্র]

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্

প্রণীত।

প্রকাশক

এ, কে, রায় এণ্ড কোম্পানী

৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

১৩০৩ সাল।

মূল্য পাঁচ সিকা]   [কাপড়ে বাঁধা মূল্য দেড় টাকা।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস

পিতাঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু

দেব,

'পলাশবনে'র ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রন্থ আপনার শ্রীচরণে অর্পিত হইবার যোগ্য নহে। তবে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত বলিয়া, আপনার নিকট ইহা অনাদৃত হইবে না, এই ভরসায়, আপনার পবিত্র চরণকমলে ইহা অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই সামান্য ভক্ত্যুপহার গ্রহণ করিলে, কৃতার্থ হই। নিবেদনমিতি

আজিমগঞ্জ } প্রণত
অগ্রহায়ণ, ১৩০৩। } শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

আমার অদ্ভুত প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহারা বিলক্ষণ আমোদ সম্ভোগ করিত। আমি তাহাদের সম্মান বা বিরাগে অবিচলিত থাকিতাম। আমি কেবল জ্ঞানসঞ্চয়েই নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতাম এবং অবসরকালে কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিতাম।

কলেজে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে, একটী সহপাঠীর প্রতি আমার হৃদয় বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। উদ্ধতস্বভাব চপলচিত্ত সহপাঠি-বৃন্দের মধ্যে কেবল সেই যুবকটিকেই শান্ত শিষ্ট ও সরলপ্রকৃতি দেখিতে পাইতাম। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল; দৃষ্টি সরল, স্নিগ্ধ, কোমল ও প্রসন্ন—যেন তদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি আপনা আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। সেই যুবকটিকে দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা হইত; কিন্তু অনেকবার আলাপ করিব মনে করিয়াও তাহার সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। একদিন কলেজের ছুটীর পর আবাসে প্রত্যাগত হইবার কালে, ঘটনাক্রমে দুইজনে পথিমধ্যে একত্র হইলাম। দুই একটী কথা কহিয়াই যুবকটির হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যুবকটিও সহপাঠীদের মধ্যে কাহারও সহিত পবিত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপ তাঁহার সহিত, তিনিও সেইরূপ আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া এতাবৎকাল ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম; বলিলাম "এখন আর শঙ্কার কোনও কারণ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সুন্দর। কিন্তু আকাশে সূর্য্য না থাকিলে, তাহার সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদেরই ছায়া আসিয়া পড়ে। সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল হয়; তাহার শত সৌন্দর্য্য চারিদিকে কেমন উছলিয়া পড়ে! আশা করি আপনিও

আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইবেন।" সেইদিন হইতে সত্যেন্দ্র ও আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম।

সত্যেন্দ্রের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় সদ্ভাবকুসুমে তাহা উল্লসিত; তাহাদের দিব্য সৌরভে তাহা পরিপূরিত এবং এক স্নিগ্ধ, শুভ্র, অলৌকিক জ্যোতিঃতে তাহা উদ্ভাসিত। সত্যেন্দ্রের হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব উপাদানে গঠিত, তাহা বলিতে পারি না। তাহাকে যতই জানিতে লাগিলাম, তাহার হৃদয়ের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রকে দেবকুমার বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম হইত। মানবসন্তানকে তো কখনও আমি এরূপ পবিত্র ও সুন্দর হইতে দেখি নাই। ঋষিকুমারেরা বুঝি এইরূপই ছিলেন। সত্যেন্দ্র বুঝি শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সত্যেন্দ্রের দেহ, মন, আত্মা সমস্তই বুঝি একই উপাদানে গঠিত! অহো, সত্যেন্দ্র আমার মনে যে আলোক আনিয়া দিল, তাহাতে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গেলাম। সত্যেন্দ্র সত্য সত্যই আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইল।

কি শুভক্ষণেই আমি সত্যেন্দ্রের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম! মাহেন্দ্র ক্ষণ কাহাকে বলে জানি না। কিন্তু এই মহাক্ষণেই আমাদের বন্ধুতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকিবে। এরূপ বন্ধু ও এরূপ মিলন জগতে অল্পই হইয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অবধি আমি আর একাকী ভ্রমণ করিতাম না। সমস্ত দিন মহোৎসাহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া, আমরা উভয়ে বৈকালে ভ্রমণের সময় ব্যাকুলহৃদয়ে একত্র হইতাম। তখন আমরা উভয়ে একমন, একপ্রাণ, একহৃদয়। তখন আমাদের এক চিন্তা,

এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা। তখন আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আনন্দের শেষ নাই। বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম, এবং সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠে আমরা এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহপাঠিবর্গ আমাদের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। কেহ কেহ আমাদের ঈর্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু অনেকেই আমাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। সত্যেন্দ্রের ও আমার পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে সন্তোষজনক হইতে লাগিল। অধ্যাপকেরা আমাদিগকে যার পর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সত্যেন্দ্র আমার ও আমিও সত্যেন্দ্রের উন্নতিতে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রকে আমি আমার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিতাম; সত্যেন্দ্রও আমাকে তাহার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিত। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আমার অন্তর্ব্বাহ্য যেরূপ জানেন, সত্যও আমার অন্তর্ব্বাহ্য সেইরূপ জানিত। তাহার নিকট আমার গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই ছিল না। তাহার নিকটে কিছু গোপন করাকে আমি পাপ মনে করিতাম। যদি কখনও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে মনে কোন মতেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতাম না। সত্যেন্দ্রও তাহার প্রাণের সকল কথা আমাকে বলিত। এইরূপে আমরা উভয়ে পরস্পরকে জানিতাম। পরস্পরের শক্তি, গুণ, ও দৌর্ব্বল্য পরস্পরের অবিদিত ছিল না। এই পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য আমরা নিয়তই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতাম। পরস্পরের যত্ন ও চেষ্টায় আমরা আমাদের স্বভাবগত দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রাণের মিলন যাহাকে বলে, সত্যের ও আমার তাহা হইয়াছিল। আমি যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী, সত্য তাহা জানিত। ফলফুল, লতা পাতা, বন জঙ্গল পাহাড় আমি যে অতিশয় ভালবাসি, সত্যের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সত্য কখনও পাহাড় পর্ব্বত দেখে নাই, সুতরাং সে আমার নিকট তাহাদের বর্ণনা শুনিতে যার পর নাই কৌতূহল প্রকাশ করিত। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের সময় আমি পশ্চিম-বঙ্গে জনক জননীর নিকট অবস্থান করিতাম। সত্যকে ছাড়িয়া সেই কতিপয় মাস অতিবাহিত করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও, কেবল একমাত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসাতেই আমি সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া পূর্ব্বের মত আর আনন্দলাভ করিতাম না। সেই পাহাড়, সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই খাল সমস্তই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আমার প্রাণের একটা স্থল যেন শূন্য পড়িয়া থাকিত; কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হইত না। তখন আমার বড় কষ্ট হইত; তখন ভাবিতাম, সত্য যদি নিকটে থাকিত, তাহা হইলে আজ প্রাণের মধ্যে এই অপূর্ণতা কখনই অনুভব করিতাম না। তখন বুঝিতে লাগিলাম, সত্যের সহিত কোনও সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে, তাহার আর মাধুর্য্য থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যকে আমি অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বেও, সত্য একবারও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এই অসামর্থ্যের কতিপয় কারণও বিদ্যমান ছিল। সত্য বাল্যকাল হইতেই জনকজননীহীন; সত্যের পিতার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে একটী পরিবারের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কলেজের ছুটী হইলেই, সত্য আপনার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইত।

প্রধানতঃ এই কারণেই, (অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া কেবল একমাত্র ভ্রমণজনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্য), আমি তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে বড় একটা অনুরোধ করিতাম না। আর একটী কারণেও, সত্য কলেজের অবকাশের সময় অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। সত্যেন্দ্রের এক পিতৃষ্বসা ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সত্যের মরুময় জীবনে করুণাময়ী পিতৃষ্বসাই স্বর্গীয় স্নেহের একমাত্র নিস্যন্দিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহসিঞ্চনে সত্যের শোকসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইত। সুতরাং কলেজের অবকাশ হইলেই, সত্য পিতৃষ্বসার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইত। এই কারণেও, আমি সত্যকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া তাহার সুখের এই সামান্য পরিমাণের আর হ্রাস করিতে চাহিতাম না। সত্য পৈত্রিক আবাসে বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম ও পুজাবকাশে পিতৃষ্বসার গৃহে গমন করিত। সেই গ্রামে তাহার পিতার জনৈক বন্ধুও বাস করিতেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নীও সত্যকে যারপর নাই স্নেহ করিতেন। একবার পূজাবকাশের সময়, আমি সত্যের ও তাহার পিতৃষ্বসার সবিশেষ অনুরোধক্রমে সত্যের সহিত সেখানে গমন করিয়াছিলাম। সত্যের পিতৃবন্ধু হরনাথ বাবুর সহিতও সেই উপলক্ষে আমি পরিচিত হই। তিনি অতিশয় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি ধনশালী, শিক্ষিত ও উদারচরিত্র। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কোনও সন্তান ছিল না। কন্যাটির নাম সুরমা। তখন তাহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বর্ষ ছিল। কন্যার তখনও বিবাহ হয় নাই। হরনাথ বাবু এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহই তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের প্রধান কারণ ছিল। বিবাহ হইলে, কন্যা পরের হইবে এবং পরগৃহে যাইবে, এই চিন্তায় হরনাথ বাবু

ও তাঁহার স্ত্রী কন্যার বিবাহ আরও দুই এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; সুতরাং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। কন্যার এই নির্ব্বাচিত পাত্র আর কেহই নহেন—আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ।

হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর এই সঙ্কল্পের কথা সত্য ও সত্যের পিতৃষসা ব্যতীত আর কেহ জানিতেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি সত্যের নিকটে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, সুরমা তাহা জানিত না। পিতামাতা সুরমার বিবাহের কথা তাহার সমক্ষে কখনও উত্থাপিত করিতেন না। আর সুরমাকে যেরূপ সরলা ও পবিত্রস্বভাবা দেখিলাম, তাহাতে তাহার মনে বিবাহের চিন্তা কখনও যে উদিত হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না। আমরা হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই। হরনাথ বাবু কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, এই মনে করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে একটী সুন্দরী বালিকা এক শেফালিকা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া একমনে পুষ্পসংগ্রহ করিতেছে। সত্য তাহাকে দেখিবামাত্র ডাকিল, "সুরমা"। সুরমা চকিতার ন্যায় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া সত্যকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাহার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাকে দেখিয়া সহসা স্থির হইল এবং "সতু দাদা, যেও না; বাবাকে ডেকে আনি" এই বলিয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, হরনাথ বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত অবলম্বন করিয়া আনন্দ ও উল্লাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য হরনাথ বাবুর

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছে, ইত্যবসরে স্থরমা সত্যের হাত টানিয়া আব্‌দারের স্বরে বলিতে লাগিল "সতুদাদা, বাড়ীর ভেতর একবার এস না, মা তোমায় ডাক্‌চেন।" কন্যার আগ্রহ দেখিয়া হরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "সতু, স্থরমার জিদ্ দেখ্‌চো না, আগে তুমি বাড়ীর ভেতর থেকেই হ'য়ে এস; আমি ততক্ষণ দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই।" এই বলিয়া, তিনি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

স্থরমাকে এই প্রথম দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। সত্য স্থরমার সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। স্থরমা সত্যকে কখন কখন পত্রও লিখিত। সেই পত্রগুলিও আমি দেখিয়াছিলাম। বন্ধুর বর্ণনে ও সেই পত্রগুলিতে আমি স্থরমার সরল পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং মনে মনে তাহার একটী চিত্রও আঁকিয়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে স্বচক্ষে স্থরমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আমার কাল্পনিক চিত্র জীবন্ত চিত্রেরই অনুরূপ বটে।

হরনাথ বাবুর সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে সত্য স্থরমার সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরনাথ বাবু সত্যকে দেখিয়া বলিলেন "সতু, তুমি স্থরমাকে যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা ও কতদূর পড়েচে, দেখ্‌লে?" স্থরমা পিতার কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল "আমি বইখানি আগাগোড়া পড়েচি। মাকে আমি সীতা সাবিত্রীর কথা অনেকবার পড়ে শুনিয়েচি।" এই বলিয়া স্থরমা তদ্দণ্ডেই অন্তঃপুর হইতে তাহার উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকখানি আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা আসিয়াই স্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিল "এতগুলি গল্পের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রীর গল্পই আমার বড় ভাল

লেগেছে। মা ব'ল্‌ছিলেন, যমকে কেউ বশীভূত করতে পারে না; কিন্তু সাবিত্রী খুব ভালমেয়ে ছিল বলেই, যম তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। হাঁ সতুদাদা, সাবিত্রী কি খুবই ভাল মেয়ে ছিল? আচ্ছা, ভাল মেয়ে কেমন ক'রে হ'তে হয়, কই বইয়ে তো তা লেখা নেই?" বালিকার আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা দেখিয়া আমরা সকলেই বড় আনন্দিত হইলাম। আমি ভাবিলাম, সুরমা যদি কখনও আমার বন্ধুর জীবনের সঙ্গিনী হয়, তাহা হইলে, তাহারা উভয়েই যথার্থতঃ সুখী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সত্যকে একবারও পশ্চিমবঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলাম না। পূজা-বকাশ ও সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশগুলি আমাকে একাকীই সেখানে কাটাইতে হইত। কিন্তু সত্য ব্যতীত আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। সত্যকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমার হৃদয়ে এই অশান্তি ও অপূর্ণতার উৎপত্তি হয়। সত্যের একখানি চিঠির জন্য সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিঠি না পাইলে, অস্থির হইতাম। মনের প্রসন্নতা কোথায় চলিয়া যাইত; আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পাঠে, আলাপে কিছুতেই সুখ ও পরিতৃপ্তি পাইতাম না। মানুষের সহবাস আমি বিষবৎ পরিহার করিতাম। এইরূপ সময়ে আমি নির্জ্জনতাই অধিকতর ভাল বাসিতাম। প্রভাতে বনের ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; সন্ধ্যার প্রাকালে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া, আকাশ পাতাল চিন্তা করিতাম। সত্যেন্দ্রের অভাবে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। একখানি চিঠি পাইলেই, ঐই

যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইতে পারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অভি-লষিত চিঠিখানিও যথাসময়ে আসিত না। সত্যেন্দ্রের উপর এক একবার রাগ ও অভিমান করিতাম; কিন্তু আবার ভাবিতাম "সত্যেন্দ্রের যদি অসুখ হইয়া থাকে!" এই ভাবনা উপস্থিত হইলেই রাগ অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। আমি তাড়াতাড়ি সত্যেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে বসিতাম। চিঠিতে রাগ অভিমানের ছায়া মাত্র থাকিত না; সত্যেন্দ্র কেমন আছে, তাহাই জানিবার জন্য কেবল ব্যাকুলতামাত্র প্রকাশিত করিতাম।

এইরূপ সত্যের একখানি চিঠির অভাবে আমি কখন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইতাম; আবার অন্য সময়ে তাহার কায়িক ও মানসিক কুশল-সংবাদ-সম্বলিত একখানি পত্র পাইলেই যার পর নাই হৃষ্ট হইতাম। কিন্তু হর্ষের পর বিষাদ ও বিষাদের পর হর্ষের এই পর্য্যায় দেখিয়া, সুখ জিনিষ-টার উপর ক্রমশঃ আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে লাগিল। সুখ জিনিষটা আমার নিকট একটা অস্থির, চঞ্চল, ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; দেখিলাম, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু প্রাণ সুখেরই জন্য লালায়িত। "কোথায় সুখ," "কোথায় সুখ," প্রাণের ভিতর হইতে নিয়ত কেবল এই এক ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে। সংসারে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমি সন্দিহান্ হইতে লাগিলাম। আমি পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, ভাল বাসি; আমার উপর তাঁহাদের কত স্নেহ ও দয়া! কিন্তু হায়, ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, হয়ত এই স্বর্গীয় স্নেহ-সুখ হইতে হতভাগ্য আমাকে একদিন বঞ্চিত হইতে হইবে। সত্যকে কত ভাল বাসি; সত্যকে ভাল বাসিয়া কত সুখ! কিন্তু হায়, দেখিলাম, এ সুখসাগরেও বিলক্ষণ জোয়ার ভাটা আছে। বিবাহের চিন্তাকে মনের মধ্যে বড় একটা স্থান দান করিতাম না; কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধটা যে আমা-

দের পবিত্র বন্ধুত্বেরই ন্যায় একটা জিনিষ হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লইতাম। সুতরাং সে সুখের উপরেও নির্ভর করিতে ইচ্ছা হইত না। পিতামাতাকে ও বন্ধুকে হারাইবার যেরূপ ভয়, স্ত্রীকে এবং পুত্রকন্যা-দিগকেও তো হারাইবার সেইরূপ ভয় আছে! তবে বিবাহ করিয়াই বা সুখ কি? অস্থির, ক্ষণিক সুখের প্রতি আমার কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।

সত্য ও আমি এই সময়ে এম্-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় একবিংশ বৎসর হইয়াছিল। আমরা উভয়েই বিশিষ্ট সম্মান ও যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় সফলযত্ন হইয়াছিলাম। যতদিন পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম, ততদিন সংসারকে বড়ই সুন্দর ও সুখময় স্থান মনে করিতাম। এ হেন সংসারে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনেকবার আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মোহাঞ্জন খসিবার উপক্রম হইতেছিল; সংসারের প্রকৃত ছবি অল্পে অল্পে আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে সংসার-প্রবেশের ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সংসারে যদি প্রকৃত সুখ পাওয়া না যায়, সংসারে প্রবেশ করিয়া লাভ কি? যদি সংসারে প্রাণের পূর্ণতৃপ্তি না হয়, তবে সংসারে প্রয়োজন কি?

এই গভীর প্রশ্নে আমার মনঃপ্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। লোকের সহবাসে থাকিয়া এই প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসার সম্ভাবনা দেখিতাম না; তাই নির্জ্জনে অবস্থান করিতাম। মুখমণ্ডল বোধ হয় চিন্তাভারাক্রান্ত দেখাইত। নতুবা যে দেখিত, সেই আমাকে আমার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত কেন? পরীক্ষায়

অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দিত হইবারই কথা; আনন্দিত না হইয়া আমি সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ থাকি কেন? কেহই আমার এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা অনেক আন্দোলন আলোচনার পর এ সম্বন্ধে একটা সুচারু সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ও জননী দেবী তাঁহাদের যথেষ্ট নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনতিবিলম্বে আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

জননীদেবী অতিশয় সরলহৃদয়া। তিনি আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিয়তই আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি পেট ভরিয়া খাই না কেন, উদাসীনের মত নির্জ্জনে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াই কেন, বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আলাপ বা আমোদে প্রবৃত্ত হই না কেন, দেবতা ও উপদেবতাদের বিহারস্থল পাহাড়পর্ব্বতে একাকী আরোহণ করি কেন, বনের ধারেই বা বেড়াইতে এত আগ্রহপ্রকাশ করি কেন,—এইরূপ তিরস্কারমিশ্রিত নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার বিষাদের কারণ অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব, ঠিক্ করিতে পারিতাম না। অনেক দিন সতুর চিঠি পাই নাই, পাহাড়ে উঠিতে আমার বড় আনন্দ হয়, বয়স্যগণের সহিত আলাপ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না,—সময়ে সময়ে আমি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতাম। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম, আমার উত্তরগুলি তাঁহার নিকট যেন সন্তোষজনক বোধ হইত না। আমি যে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি, অবশ্য সে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন নাই। বিবাহের নাম শুনিলে আমি যে অত্যন্ত বিরক্ত হই, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণে আমার

সাক্ষাতে বিবাহের কথা কথনও তুলিতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, অতঃপর আমার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহার ভয় হইয়াছিল, আমাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে হয়ত আমি উদাসীন হইয়া যাইব। বলা বাহুল্য, প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা এই ধারণাটিকে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে বিলক্ষণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার বিবাহের প্রস্তাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ও জীবনোপায় স্থিরীকৃত না করিয়া বিবাহ করিতে কথনই সম্মত হইব না, ইহা পিতৃদেব, জননী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয় এই কারণেই এতদিন আমার বিবাহের নিমিত্ত তাদৃশ উদ্যোগী ছিলেন না। এক্ষণে আমার বিবাহের চিন্তায় অপর দশজনের নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত ও শিরোবেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি বাধ্য হইয়া, লোকলজ্জার খাতিরে, আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বয়স্যগণের নিকট আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া আমার হৃদয়ে দুঃখ, অভিমান, বিরক্তি ও হাস্যরসের বিচিত্র সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব লীলা আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়, আমার হৃদয়ের গভীর অশান্তির কারণ কেহই অবগত হইল না। কাহাকেও তাহা বলিলামও না। যাহাকে তাহাকে তাহা বলিয়াই বা কি ফল হইবে? কেই বা তাহা বুঝিবে? বুঝিলেই বা কে আমার সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ আমার অশান্তির কারণ জানিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝিলাম, সেই মহাপুরুষ ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপরে ধীরে ধীরে নির্ভর করিতে লাগিলাম।

আমার বিষাদের এই প্রগাঢ় ছায়া সত্যের প্রসন্ন হৃদয়কেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সত্য স্বভাবতঃই আমাকে গম্ভীর বলিয়া জানিত; কিন্তু গম্ভীর হইলেও আমার যে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। এইবার পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া আমি হৃদয়ে যে গুরুতর প্রশ্নের আন্দোলন অনুভব করিলাম, তাহার দুই একটী তরঙ্গ তাহাঁর হৃদয়কেও অভিঘাত করিয়াছিল। সত্য আমাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। আমার হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্য যে কিরূপ লালায়িত, তাহা তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যতৃষা জগতের কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না, হইবারও নহে। জগতের প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, জগতের সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা আছে। প্রাণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। তাই হৃদয়ের আবেগে তাহাকে লিখিয়াছিলাম "আমি এই জগতের কোনও পরিমিত রূপে বা সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে চাই না; তাহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে চাই না। আমি চাই ডুবিতে এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরে; আমি চাই তন্মধ্যে আত্মহারা হইতে, তন্মধ্যে মিলিয়া যাইতে। সেই রূপসাগরে, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরে না ডুবিতে পারিলে কি আমার তৃপ্তি জন্মিবে? জীবনে শান্তি পাইব? যেখানে সমস্ত সৌন্দর্য্য মিলিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত হইয়াছে, হায়, কবে আমি সেই স্থানে যাইব, কবে আমি তাহা দেখিয়া চরিতার্থ হইব? আহা, কি শান্তির নিলয় তাহা! কি অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার তাহা! সে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সে আনন্দে শঙ্কা নাই, সে সম্ভোগে বিলাস নাই। জগদীশ, কবে আমায় সেই স্থানে লইয়া যাইবে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমবঙ্গ আর ভাল লাগিল না। আমার বিষাদরোগের প্রতীকার করিতে সকলেই উদ্যুক্ত; কিন্তু অবিচক্ষণ বৈদ্যের ন্যায় কেহই আমার রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিকেই বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে প্রাণে বিরক্তি জন্মিল। নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ, উপত্যকা, কোন স্থানেই আর সুখ পাইলাম না। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিতে আমায় কলিকাতায় যাইতে হইবে; সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিয়া বরং শান্তি ও নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সত্য আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং সে আমার মনে শান্তি আনয়নের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। আমি সত্যের সহবাসে অনেকটা আশ্বস্ত হইতাম বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতর অশান্তির ছায়া লুক্কায়িত থাকিত।

সত্য এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইল। আমি আইন পড়িতে লাগিলাম। কেন আইন পড়িতেছি, আইন পড়িয়া কি করিব, তাহা ভাবিলাম না। আইন পড়িতে হয়, তাই পড়িতে লাগিলাম। প্রত্যহ কলেজে যাইতাম, কিন্তু সেখানে কি বিষয় পঠিত হইতেছে, তাহার বড় একটা সংবাদ রাখিতাম না। অধ্যাপক আসিয়া যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। আইনের নীরস ব্যাখ্যাগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। মন তখন কলেজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিত; আমিও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, সহপাঠীরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোনদিকেই আমার লক্ষ্য থাকিত না। অধ্যাপক মহাশয় কখন কখন পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোনও অদ্ভুত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেন; সহপাঠীরা প্রায় সকলেই তাহাতে যোগদান করিত। তাহাদের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কখন কখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত; আমি চকিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিতাম এবং হাস্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অপ্রতিভের ন্যায়, মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি সচরাচর সকলের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিতাম। সহপাঠিবর্গের মধ্যে কেহই একটী দিনও আমাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করে নাই, ইহা তাহাদের সবিশেষ উদারতারই পরিচয় সন্দেহ নাই।

দিনের মধ্যে কেবল এক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলেজে যাইতে হইত। সেই ঘণ্টাটি অতিবাহিত করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই বাসায় থাকিতাম। সত্যেন্দ্র বৈকালে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে,

কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার সহিত মিলিত হইতাম। অন্যান্য সময়ে বাসায় বসিয়া কেবল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতাম। আমার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অবশ্য ব্যবহারশাস্ত্র ছিল না। তবে আমি কি কি বিষয় পাঠ করিতাম? সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে দুইটী ব্যক্তির রচনা আমার প্রাণস্পর্শ করিত। ইংরাজীতে কবিবর ওয়ার্ডস্বয়ার্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কবি-গুরু মহর্ষি বাল্মীকি। উভয়েরই মর্ম্মস্পর্শিনী রচনায় আমার ভাবসাগর উথলিয়া উঠিত। উভয়েরই নির্ম্মল পবিত্রজীবন, উভয়েরই ধর্ম্মভাব, উভয়েরই পূর্ণ আদর্শের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং উভয়েরই বাল-সুলভ সরলতা আমার হৃদয় মন মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থের তুলনা করিতেছি না; বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্ব-য়ার্থ কেন, জগতের কোন কবিরই তুলনা হয় না। কিন্তু তুলনা না হইলেও, বাল্মীকি ও ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি উভয়কে একই লক্ষ্যস্থলের যাত্রী স্থির করিয়াছিলাম। উভয়েরই লক্ষ্য পূর্ণ আদর্শ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ পবিত্রতা। তাই উভয়েরই একমাত্র সাধ্য ও আরাধ্য বস্তু—সেই সত্য, সুন্দর, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; তাই উভয়েরই নিকটে আদর্শ কবি—সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাকবি, যাঁহার অপূর্ব্ব রচনা এই অপূর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—সামান্য বৃক্ষপত্রে, তৃণদলে, বালুকাকণায় যাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বসুধা সহস্রধারায় উছলিয়া উঠিতেছে,—যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় মন অভিভূত হইতেছে। তাই উভয়েই সেই মহাকবির অপূর্ব্ব রচনা পাঠ করিতে করিতে জীবনকে অতিবাহিত ও ধন্য করিয়াছেন, তাই উভয়েই নির্জ্জন অরণ্যে ও পর্ব্বতময় প্রদেশে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং দিব্য আন-ন্দের অধিকারী হইয়া সার্থকজন্মা হইয়াছেন। বাল্মীকি তো মহর্ষিই ছিলেন; ওয়ার্ডস্বয়ার্থও ঋষিজনোচিত জীবন যাপন করিয়া এই পাপ-

যুগে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। আমি উভয়েরই উপাসক হইলাম; উভয়েরই কাব্য পাঠ করিয়া হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সংশয়জাল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। এক দিব্য জ্যোতিঃতে হৃদয় মন পূর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমি এই মানবজীবন বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হইতে দিব না; যে কার্য্যে আত্মা আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, সে কার্য্য প্রাণান্তেও করিব না। সংসারের ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য কোন কালেই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইবে না। সেই জ্যোতির্ম্ময়ই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবেন। আত্মার আনন্দের জন্য সকলই পরিত্যাগ করিব। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার একমাত্র আধার সেই মহান্ পরমেশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সেবাতেই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিব। আমার জীবনের লক্ষ্য এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, আমি কিয়ৎপরিমাণে শান্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মা যে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার কৃপা লাভ করাই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। হৃদয়ঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সংসারের কোলাহলে আমি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্যহীন হইলেই, সাংসারিকতা ধীরে ধীরে আমার মনটিকে অধিকার করিয়া বসিত। কিন্তু সংসারের আমোদ প্রমোদে আত্মা তৃপ্তি লাভ করিত না; সুতরাং আমিও প্রকৃত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ অবস্থায় আহারে, শয়নে, পাঠে, আলাপনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না এবং সহস্র চেষ্টাতেও মনকে নির্ম্মল ও সাংসারিকতাকে দূরীভূত করিতে পারিতাম না। মোহ যেন আমাকে জড়াইয়া থাকিত। কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে কোন বস্তুই যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, মোহাচ্ছন্ন হইয়াও আমি তদ্রূপ কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পাইতাম না। মনে তখন বড় যন্ত্রণা হইত। যন্ত্রণা সময়ে সময়ে অসহ্যও হইয়া পড়িত। তখন নির্জ্জনে বসিয়া কিম্বা

উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম এবং কাতর হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের দুঃখভার যেন লঘু হইত, কুয়াসা যেন কাটিয়া যাইত, এবং প্রাণ যেন শান্তিরসে সিক্ত হইত। মেঘ-বৃষ্টি-ঝটিকা-বজ্রময় দুর্দ্দিনের শেষে নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল প্রভাকরের প্রকাশে ধরণী যেরূপ হাস্যময়ী হয়, প্রার্থনার পর আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হৃদয়রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইত। হৃদয়ের এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাবটির সংরক্ষণের জন্য আমি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু কালক্রমে দেখিতে পাইলাম, প্রার্থনা বা ঈশ্বর-চিন্তাই ইহার একমাত্র উপায়। তদবধি প্রার্থনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম। যখনই হৃদয়ে অন্ধকার বা কুয়াসা আসিবার উপক্রম হইত, তখনই পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বসিতাম। পরমেশ্বরের কৃপাতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিত। প্রার্থনাই যে আত্মার একমাত্র জীবনীশক্তি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ইহার পর আমার মনের অবস্থাও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তেমনই প্রবল রহিল বটে, কিন্তু মন প্রসন্ন ও পবিত্র না থাকিলে কিছুই ভাল লাগিত না। শুধু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেন, এরূপ অবস্থায় বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ড-স্বয়ার্থের মধুময়ী কবিতারও কিছুমাত্র মাধুর্য্য থাকিত না। ভগবদুপাসনা দ্বারা মন পবিত্র ও হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য্য কিছুতেই প্রতিভাত হইত না। পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য দেখিলেই তাহাতে মুগ্ধ হইতাম, কিন্তু এখন আর সে প্রকার অবস্থা রহিল না। এখন যে কোন অবস্থায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমি আবিলহৃদয়ে যখনই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রলয় ও হাহাকার

উঠিয়াছে। তখনই আমি কাহার জলদগম্ভীর রবে যেন স্তম্ভিত হইয়াছি। সেই রব শুনিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, শরীর শিহরিয়া উঠিত, গণ্ডস্থল বহিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু পড়িত ও সংসার যেন আমার চক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইত। কিন্তু ভগবদুপাসনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে, বাহ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সহজেই উপভোগ করিতে পারিতাম, পরমেশ্বরের মহিমা ও কৃপা জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতাম; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিত্বসুধা পান করিতে সমর্থ হইতাম; মহর্ষি বাল্মীকির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হইতাম; তাঁহার ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত দণ্ডকারণ্যের প্রাণস্পর্শিনী শোভা ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইতাম এবং জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবী, ভগবান্ রামচন্দ্র ও মহাত্মা লক্ষ্মণের অলৌকিক চরিত্রের আলোচনা করিতে করিতে মানস-চক্ষে যেন স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিতাম। তখন হৃদয় প্রসারিত হইয়া যেন ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত হইত; মোহমুগ্ধ মানবের অসার কোলাহলে প্রাণ ব্যথিত হইত; জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত; রাগ, দ্বেষ,অভিমান কোথায় লুকায়িত হইত; শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকিত না এবং সকলকেই ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত। তখন মনে করিতাম, সকলের দ্বারে দ্বারে আনন্দ ও শান্তির সমাচার আনয়ন করিব; সকলকে পবিত্র হইতে বলিব; সকলকে মহান্ পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিব। এইরূপ মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া, আমি মধ্যে মধ্যে স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যাইতাম, ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভব করিতাম না, হাতের পুস্তক হাতেই থাকিত এবং কেহ নিকটে আসিলেও তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না।

উপাসনা, সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠই এই সময়ে আমার

প্রধানকার্য্য হইয়া উঠিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু মহাত্মাদিগের গ্রন্থাদি পাঠে আমি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ করিয়া আমি যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ড্‌স্‌ব্যার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। মনঃপ্রাণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থনিচয়ের মহাভাবে যতক্ষণ নিমগ্ন থাকিত, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। নির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ হইলে, দীপ্তিময়ী তারকারাজি যেরূপ আর চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, গীতা ও উপনিষদের মহাভাবে নিমগ্ন হইলে, বাল্মীকি বা ওয়ার্ড্‌স্‌বার্থের কবিতাও সেইরূপ আমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিত না। কিন্তু অন্য সময়ে, অর্থাৎ আমি সংসারের কোলাহলময় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, ইহারাই আমার জীবনাকাশে সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় সুশোভিত হইতেন।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় আমি আমার জীবনের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। আমার লক্ষ্যও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তদনুসারে আমি আমার কার্য্যাদি নিয়মিত করিতে প্রস্তুত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেন, তখন জীবনের কার্য্যসকলও একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আমি ব্যবহার-শাস্ত্র-পাঠ পরিত্যাগ করিলাম। ব্যবহারজীবী হইলে, অনেক সময় সত্যপথে চলিতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল। সত্যই পরমেশ্বর; সুতরাং পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বসময়ে নির্ম্মল সত্যেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বাধীনতা না থাকিলে, সত্যের উপাসনা করা যায় না। এই কারণে স্বাধীনতা লাভের জন্যও ব্যাকুল হইলাম। স্বাধীনতা অর্থে, আমি মনের ও আত্মার স্বাধীনতার কথাই বলিতেছি। এই স্বাধীনতালাভের পথে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য পরের দাসত্বকেই আমি প্রধান অন্তরায় মনে করিলাম। এই কারণে স্থির করিলাম, কাহারও বর্ত্তনভোগী হইব না। তবে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব? আমার সংসার অর্থে কেবল আমাকেই বুঝাইত। পিতামাতাকে

আমার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত না। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ-পদে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। আমিও বিবাহ করি নাই এবং সঙ্কল্প করিতেছিলাম, হয়ত বিবাহ করিবও না। সুতরাং আমার একমাত্র চিন্তা, কেবল আমারই প্রতিপালনের জন্য। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারও একপ্রকার উপায় হইয়া গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটী পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইলাম। পিতৃদেবকে অনু-রোধ করায় তিনি আমার জন্য সেই মুদ্রায় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন। সে ভূসম্পত্তির উপসত্ব বার্ষিক ছয় শত টাকা মাত্র। ইহাই আমাব আয় নির্দ্দিষ্ট হইল। এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য, পিতৃদেব, জননী ও আমার অগ্রজ ভ্রাতারা আমার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে আমাকে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, তাঁহাবা দুঃখিত মনে নিরস্ত হইলেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আমিও যার পর নাই আনন্দিত হইতাম; কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না থাকাতে, আমি অগত্যা নিজ ইচ্ছামতই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলাম। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, পিতৃদেবকে আমি আমার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জানাইয়াছিলাম; তিনি যেরূপ বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও উদারচিত্ত, তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমাকে আর কোনও বাধা দিলেন না। কেবল জননী দেবীকেই কোনপ্রকারে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি এখন বিবাহ করিব না এবং অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় কোনও উচ্চপদে আরোহণের

চেষ্টা করিব না, ইহা অবগত হইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমি যে উদাসীন হইয়া যাইব, এই বিশ্বাসটি তাঁহার মন হইতে কোনপ্রকারেই অপসারিত করিতে পারিলাম না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা, আমি যে উদাসীন হইব না,সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এখন বিবাহের কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি জোর করিয়া বিবাহ দিলে, আমি চিরকালের জন্য অসুখী হইব। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই পল্লীর অনতিদূরে আমি যে মৌজা ক্রয় করিয়াছি, সেই স্থানে আমি একটী ঘর প্রস্তুত করিব। সেই স্থানে নিয়ত থাকিলেও, আমি প্রত্যহ তোমাদের চরণদর্শন করিতে আসিব ও সেবাশুশ্রূষা করিব। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি এই অপেক্ষাকৃত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারি, তাহা হইলে কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।" এই বলিয়া আমি তাঁহার নিকট আর্য্যগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, আর্য্যমহিলা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিলাম এবং পরিশেষে আমার সঙ্কল্পটি অনুমোদন করিতে তাঁহাকে অনুনয় করিলাম। পুত্রবৎসলা জননীদেবী আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আমার বিবাহ দেখিলে যে সুখে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন, সেই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

সত্যকেও আমার সঙ্কল্পের কথা সমস্ত জানাইলাম। সত্যও আমাকে প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে সেও

আমার সঙ্কল্পটিব অনুমোদন করিল। এইরূপে চারিদিকেব পথ পরিষ্কৃত হইলে, আমি পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে আমার অভিলষিত মনোরম স্থানে একটী আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইলাম। স্থানটির নাম পলাশবন। কিন্তু নামটি পলাশবন না হইযা শালবনই হওয়া উচিত ছিল। সেই স্থানের কিয়দ্দূরে কতিপয় পলাশ-বৃক্ষ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তদ্দ্বারা সেই স্থানটি তাহাদের নামেই অভিহিত হইতে পারে। আবাস-বাটীর সন্নিকটেই শ্যামল শালবন শোভা পাইতেছিল। অনতি-দূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটিরও নাম পলাশবন। গ্রামেব অধিকাংশ অধিবাসীই নিরীহ কৃষক; কিন্তু সেখানে কতিপয় ঘর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতিও বাস কবিত। গ্রামবাসী ব্যক্তিরা আমাকে তাহাদেব প্রতিবাসী হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি একটী শুভ-দিনে বাস্তু-শান্তি করিযা নূতন গৃহে প্রবেশ করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিরূপ স্থলে বাটী নির্ম্মিত হইল, তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাউক। পিতৃদেব যে স্থানটী বসবাসের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। এই ভূখণ্ডের উত্তর ভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটী অনুচ্চ শৈল। শৈলের উপরে দুই একটী পলাশ বৃক্ষ ও আরণ্যলতা ভিন্ন আর কোনও উদ্ভিদ্ নাই। বোধ হয়, বহুপূর্ব্বে শৈলটি একটী অখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ছিল; কিন্তু তাহা কোনও নৈসর্গিক কারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই শৈলের পাদমূলে ও চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তররাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে; দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী স্থানটির শোভাবর্দ্ধনের জন্য অতিশয় যত্নসহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ড ও কৃষ্ণপ্রস্তর স্তূপসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে ভীষণতা আনয়ন করিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন আরণ্য হস্তিযূথেরা যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন ও উপবেশন

করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে। সেই স্থানে পলাশবৃক্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য জাতীয় বৃক্ষ নাই। একটী ক্ষুদ্র তটিনী কোন্ এক অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই শৈলের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে করিতে অদূরে শ্যামল অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলধারা উল্লাসে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে এক মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। শৈলের পাদমূল হইতে ভূখণ্ডটি আনত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই ভূখণ্ড বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বন নিবিড় নহে, এবং বৃক্ষাদির মধ্যে শালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষও বিস্তর। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থলে কতকগুলি শাখাপ্রসারী প্রগাঢ়-ছায়া-সমন্বিত বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমগ্র ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় চারি শত বিঘা। ইহার উত্তরদিকে পূর্ব্বোক্ত শৈল ও পলাশবৃক্ষরাজি; পশ্চিমদিকে যমুনা তটিনী ও নিবিড় বন; দক্ষিণদিকে যমুনা ও গুল্মাচ্ছন্ন ভূমি; পূর্ব্বদিকে একটী গ্রাম্য রাজপথ; এই পথের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই পলাশবন গ্রাম, যাহার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

গ্রাম্য রাজপথের পশ্চিম ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি বনাচ্ছন্ন নহে। পূর্ব্বে অবশ্য এখানে বন ছিল; কিন্তু তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুন্দর বৃক্ষই যদৃচ্ছাক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই বৃক্ষগুলি কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে। আমি এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তুত করাইলাম। আবাসবাটী দক্ষিণ-দ্বারী; তাহার বামভাগে অদূরে গ্রাম্য রাজপথ ও পলাশবন গ্রাম; দক্ষিণভাগে কতিপয় হস্ত দূরেই শালবন; সম্মুখে কিয়দ্দূরে যমুনাতটিনী ও গুল্মাবৃত ভূমি; তটিনীর পর পারে আবার শ্যামল বন। পশ্চাতে শালবন ও শৈল। বাটীর অব্যবহিত তিন

দিকেই বৃহৎবৃক্ষশোভিত পরিষ্কৃত ভূমি, কেবল পশ্চিম দিক্‌টিই শাল-বনের সহিত একেবারে সংলগ্ন।

বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত হইল। একটী বৃহৎ পরিবার যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারে, পিতৃদেব তদুপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করাইলেন। আমি কিন্তু এত বড় গৃহের পক্ষপাতী ছিলাম না। দ্বিতলেও কতিপয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। এরূপ উচ্চ ভূমিতে দ্বিতল গৃহেরও কোন আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু কেবল চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই ঈদৃশ গৃহ-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতলের একটী গৃহ পাঠগৃহে পরিণত হইল। ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকাবলী সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিলাম। তিন দিকের গবাক্ষ উন্মোচন করিলে, সেই গৃহের মধ্যে বসিয়াই প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে পাইতাম। কত অজ্ঞাতনামা সুকণ্ঠ আরণ্য পক্ষী বাটীসংলগ্ন বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। আরণ্য-কপোতের কূজনে সেই স্থান প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রতিধ্বনিত হইত। কখন একটী হরিণশিশু সহসা নয়নপথে পতিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া যাইত; কখনও বা শশকেরা নির্ভয়ে বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের সুকোমল পত্রগুলি চর্ব্বণ করিত। দূরস্থিত নিবিড় অরণ্য হইতে কখন কখন ময়ূরের কেকারবও শুনিতে পাইতাম। বলা বাহুল্য পলাশবন বা তাহার সন্নিহিত স্থানসমূহে হিংস্র জন্তুর তাদৃশ ভয় ছিল না। হিংস্র জন্তুরা অরণ্যে থাকিলেও লোকালয়ের সন্নিকটে প্রায় আসিত না। আমি বহুকাল মৃগের ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোনও হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়ি নাই।

আমার আবাসবাটীর কথা বলিলাম; এক্ষণে পলাশবন গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। জনসমাজমধ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি

মানব-হৃদয়ে এরূপ প্রবল যে, অতীব নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও, আমরা লোকসমাজ হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসি না। মানবের মুখমণ্ডলে যে একটী অপূর্ব্ব আত্মীয়তা ও সমবেদনার ভাব অঙ্কিত আছে, তাহা জড়, উদ্ভিদ্ বা নিকৃষ্ট প্রাণিজগতে সহস্র চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট জীবেরাও স্ব স্ব শ্রেণীতে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আমি যেখানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলাম, তাহার সন্নিধানে যদি গ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে আমি ঐ স্থানে কখনও একাকী বাস করিবার সঙ্কল্প করিতাম কিনা, সন্দেহ স্থল। যাহা হউক, এই গ্রামের নিকটে বাস করিয়া আমি যার পর নাই সুখে কালযাপন করিতেছি ও নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। গ্রামের নিরীহ কৃষকদের সহবাসে আমি যে আনন্দ-ভোগ করিয়াছি, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সহবাসেও তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে যেরূপ স্নেহ, দয়া ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য নহি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই পলাশবনের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার উদারচরিত্র, উন্নত ধর্ম্মজীবন ও গভীর জ্ঞানের যথোচিত তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহিণী একটী আদর্শ গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা আদর্শ পুত্র-কন্যা। যথাসময়ে পাঠকবর্গ ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইবেন। ইঁহা-রাই কৃষক ও অন্যান্য পরিবারবর্গের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সামান্য কুটীরে যে জ্ঞান, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অস্পষ্ট ছায়াও যে কখন আমার গর্ব্বিতচূড় দ্বিতলগৃহে দেখিতে পাইব, তাহার আশা করিলাম না। এই অজ্ঞাত-নামা পলাশবনে যে শেষে আমার বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগরিমা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের লীলা।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া অবধি, আমি কি জন্য পলাশ-বনে আসিয়া বাস করিলাম, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি যে পলাশবনের ন্যায় একটী গ্রাম সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমি কেন, অনেক ব্যক্তিই জানিতেন না। ইহার একটী কারণও ছিল। গোস্বামী মহাশয় পলাশবনের আদিম নিবাসী নহেন; ইনি সবে দুই তিন বৎসর মাত্র পলাশবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে হুগলি জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে ইহার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু হুগলি জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, রোগযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, ইনি পলাশবনে আসিয়া সপরিবারে এক শিষ্যের বাটীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। দরিদ্র শিষ্যের বাটীতে বহুদিন থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, ইনি এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করেন। পলাশবনে অবস্থানকালে ইহার উন্নত ধর্ম্মজীবন ও উদারচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রায় গ্রামশুদ্ধ লোকই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদেরই সবিশেষ অনুরোধক্রমে ইনি পলাশবনে বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন।

এই সঙ্কল্পানুসারে ইনি স্বদেশের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে পলাশবনে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাহার উপসত্ত্বেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত হন।

আমার গৃহনির্ম্মাণ কালে তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য, পিতৃদেব প্রায়ই পলাশবনে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ দুই চারিবার গতায়াত করিতে করিতে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। গৃহ প্রস্তুত হইলে আমি যে দিন পলাশবনে গৃহ দেখিতে প্রথম আসিলাম, সেই দিন পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমি যে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাহা পলাশবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শুনিয়াছিল, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমার আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না। আমরা সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাঁহার বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ আটচালাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রামবাসিনী বর্ষীয়সীরাও সেখানে একত্র হইয়াছেন। খোল, করতাল ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্র সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই লোকারণ্যের মধ্যে একটী উচ্চ বেদী; বেদীটি নানাবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেরই গলদেশে এক একটী পুষ্পমালা লম্বিত। বেদীর উপর একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ চন্দনচর্চ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেবকে দেখিবামাত্র সকলে প্রণাম করিল এবং ইঙ্গিতে আমার পরিচয় পাইয়া আমাকেও অভিবাদন করিল। আমি উপবিষ্ট হইলে, দেখিলাম সভাস্থ সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। পিতা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে 'গোস্বামী মহাশয় কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্যক্তি উত্তর

দিবার পূর্ব্বেই, গোস্বামী মহাশয় আটচালা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল ; পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে,সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরিচয় পাইয়া আমারও যথোচিত সমাদর করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ শুনিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই সেই ভক্তির উদয় হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন, আমি পলাশবনে বাস করিলে গ্রামবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত ও উপকৃত হইবে এবং আমার সংকল্প যে সাধু এবং আজিকালিকার দিনে কিছু আশ্চর্য্যেরও বিষয়, এই সম্বন্ধে পিতৃদেবের সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তিনি বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাঠারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইল। গয়ারাম ঘোষ নামক জনৈক প্রবীণ গ্রামবাসী গায়কদলের নেতা হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিরসের মধুর স্রোত ছুটাইলেন। আমি অনেক সুগায়কের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ; কিন্তু গয়ারাম ঘোষের তানলয়হীন ভক্তিমিশ্রিত আড়ম্বরশূন্য সরল হরি-সঙ্কীর্ত্তনে আমার অন্তরাত্মা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিল, এরূপ পরিতৃপ্তি আমি বহুকাল অনুভব করি নাই।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে পল্লীর বালকবালিকারা দলে দলে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতেও দুইটী বালিকা ও একটী বালক আসিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইল। বালকটি সর্ব্বকনিষ্ঠ। আকার প্রকারে বুঝিলাম, ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যা। ইহাদের সকলেই শান্তমূর্ত্তি, সুশ্রী ও

সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ইহাদের সকলেরই মুখমণ্ডলে মাধুর্য্য ও পবিত্রতাব্যঞ্জক কেমন একটী দিব্য লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছিল। সে লাবণ্যের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাহাতে চক্ষু পড়িলে, সহজে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। চক্ষু যেন সেই লাবণ্যসুধা অবিতৃপ্তরূপে পান করিতে থাকে। আমি প্রাণস্পর্শী মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন সেই বালকবালিকাগুলিকে দেখিয়া মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাপকোলাহলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছি। মুহূর্ত্তমধ্যে এই স্থূল জড়দেহ যেন পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল; অশরীরী লঘু আত্মা যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে কোনও জ্যোতিষ্কের ন্যায়, সেই সঙ্গীতোদ্দীপিত ভাবরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক কথায়, কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসঙ্গীতের সহিত আমার আত্মার গভীর সঙ্গীত যেন মিলিত হইয়া গেল এবং আমিও যেন স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিয়ৎক্ষণপরে সঙ্গীত নিবৃত্ত এবং সভাস্থল নীরব হইল; কিন্তু আমার আত্মার মধ্যে যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছিল,তাহার আর নিবৃত্তি হইল না; গোস্বামী মহাশয় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না ও সেই সভাস্থ কোন ব্যক্তিই আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইল না। আমি এক অনির্ব্বচনীয মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম। কতক্ষণ এইভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তবে তাহা যে বহুক্ষণ হইবে, তদ্বিষযে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয় সে রাত্রির মত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পিতৃদেব আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন "দেবু, তোমার কি নিদ্রা-

কর্ষণ হইতেছে? রাত্রি অধিক হইয়া থাকিবে; চল, অদ্যকার মত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করা যাউক।” এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, আমিও তাঁহার কথায় সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা দণ্ডায়মান হইলাম। তৎপরে উভয়ে গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। গ্রামস্থ ব্যক্তিরাও একে একে গৃহে গমন করিতেছিল; কেহ কেহ আমাদের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত হইল। আমরা পিতা পুত্রে আরণ্যপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। জ্যোৎস্নালোকে আরণ্য রাজপথ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। পথের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী শালবনের মনোহারিণী শোভা নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। বৃক্ষরাজি নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা 'সুধাকরের সুধাংশুরাশি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে; যেন তাহাদেরও সরস হৃদয় মধ্যে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছে। নীরব আরণ্য পথে বনের এই বিচিত্র ভাব ও শোভা দেখিতে দেখিতে স্বপ্নাবিষ্টচিত্তে পিতৃদেবের সহিত চলিতে লাগিলাম। সহসা তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“দেবু, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তোমার মনে কি হইল?”

আমি বলিলাম “গোস্বামী মহাশয়কে মহাত্মা ব্যক্তি বলিয়াই আমার মনে হইল। এরূপ ব্যক্তির নিকটে থাকিতে পাইব বলিয়া আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।”

পিতৃদেব বলিলেন “গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে আমারও ঐরূপ মত বটে। তুমি কি তাঁহার ছেলে মেয়েগুলিকে দেখিয়াছিলে?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্ ছেলে মেয়েগুলি? যা'রা তাঁ'র দক্ষিণ দিকে ব'সে ছিল, তারাই কি?"

পিতৃদেব বলিলেন "হাঁ, তারাই বটে।"

আমি বলিলাম "বেশ ছেলে মেয়েগুলি।"

পিতৃদেব নীরব হইলেন; আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। আমিও যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ভয় হইতেছিল, ভাগবতের যে বিষয় অদ্য ব্যাখ্যাত হইতেছিল, পাছে তাহারই সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন। সে রাত্রিতে কি বিষয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না। যাহা হউক, পিতৃদেব নীরব হইলে আমার চিন্তাস্রোত কি-জানি-কেন গোস্বামী মহাশয়ের সেই ছেলেমেয়েগুলির দিকেই প্রধাবিত হইল। সেই সুন্দর মুখগুলি আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি মুখ কেমন সুন্দর ও পবিত্র! যেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য; যেন পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতা! কি-জানি-কেন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।
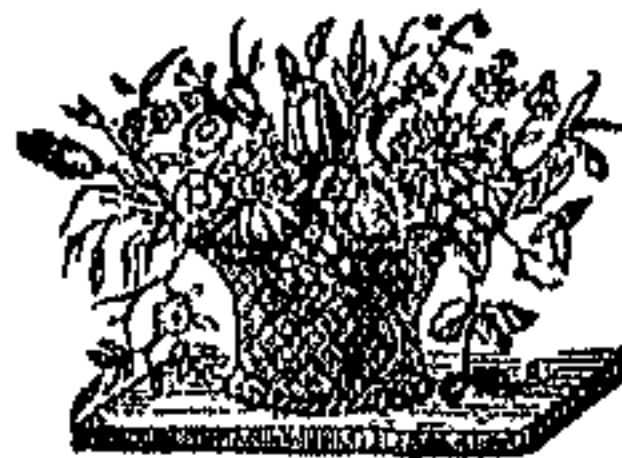
দশম পরিচ্ছেদ।

পলাশবনে আসিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলাম। আমার নূতন গৃহে প্রথম কতিপয় দিবস প্রায় প্রত্যহই বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু সকলের সহিত পরিচয় কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। গ্রাম-বাসী অধিকাংশ ব্যক্তিকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমার মত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি গ্রামে অত্যল্পই ছিল। সুতরাং আমার নিকটে আসিয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর কাহারই ছিল না। কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; কেবল সন্ধ্যার পর তাহাদের কিছু অবকাশ হইত। এই অবকাশ সময়টি তাহারা সাধারণ আটচালা-গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিবাহিত করিত। আমিও হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-কথা শুনিবার আশায় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইতাম।

গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যাগুলিকে প্রতিদিন বেদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতাম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে। শুনিলাম কন্যাটির তখনও বিবাহ হয় নাই। কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়াই বিবাহ হয় নাই; নতুবা অনেকদিন বিবাহ হইয়া যাইত। গোস্বামী মহাশয় পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করায় যোগ্য পাত্র সন্ধানের পক্ষে কিছু বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটিতেছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে একটীও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নাই। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার আরও কিছু দিন অনূঢ়া থাকা ভাল, শুনিলাম গোস্বামী মহাশয়ের ইহাই মত। গয়ারাম ঘোষের মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এই মত শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যভাব-বর্জ্জিত জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে এরূপ মত হইতে পারে, ইহা আমার নিকট কিছু অভিনব ও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

আমি যাহাতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, তদ্বিষয়ে গ্রামবাসী ব্যক্তিরা যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। কেশব ঘোষ নামে একটী পিতৃ-মাতৃহীন কৃষক যুবা আমার একান্ত অনুগত হইল। তাহার ভূসম্পত্তি কিছুই না থাকায়, সে দৈহিক পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। তাহার পবিত্র স্বভাবের জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে ভাল বাসিত। আমিও কেশবের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ ও সরল সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইতাম। তাহাকে আমার নিকটে রাখিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার উপযুক্ত মাসিক বর্ত্তন স্থির করিয়া তাহাকে আমার গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।

আমার আবার গৃহকার্য্য কি, তাহা হয়ত পাঠকবর্গের জানিতে

কৌতূহল হইয়া থাকিবে। গৃহকার্য্য আর কি? গৃহটিকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যগুলির যত্ন করা এবং আমার অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেশবের ইহাই গৃহকার্য্য ছিল। জননীর অনুরোধে আমি বাটীতেই আহার ও শয়ন করিতাম। আমি যে জঙ্গলের মধ্যে, গ্রামের বহির্ভাগে ও এক জনশূন্যপ্রায় গৃহে বাস করিয়া থাকিব, এ প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়াও আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। সুতরাং আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পলাশবনে আগমন করিতাম এবং কেশবের নিকট বিগত নিশার সংবাদাদি শুনিয়া ভ্রমণ জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। ভ্রমণের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দিক্ ছিল না। কিন্তু আমি সচরাচর সর্ব্বাগ্রে গৃহের উত্তরদিক্‌স্থ সেই কৃষ্ণ শৈলের নিকট উপস্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতাম এবং সেই উচ্চস্থান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া লইতাম। নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে নয়নমন কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলে, আমি যমুনাতটিনীর বক্রগতি ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যের নানাস্থানে উপস্থিত হইতাম এবং প্রকৃতির ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতাম। প্রথমে যমুনার অনুসরণ করিতে করিতে আমি আমার বাটীর পশ্চিম দিক্‌স্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতাম, পরে গৃহের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতাম। সেই দিকে যমুনাতটবর্ত্তী উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে উপনীত হইতাম। তৎপরে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া নিজ কুটীরে উপনীত হইতাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান ও কিছু ভক্ষণ করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখানে ইচ্ছামত পাঠাদি সমাপন করিয়া বাটীতে

আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতাম। অপরাহ্ন সময়ে আবার আমি পলাশবনে আসিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতাম এবং সন্ধ্যার পর আটচালায় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আবার বাটীতে প্রত্যাগত হইতাম। গৃহ পর্য্যন্ত প্রায়ই কেহ সঙ্গে যাইত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কোন লোকেরই প্রয়োজন হইত না; তবে অন্ধকার হইলে, একটা আলোকের আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। সেই সময়ে জননী দেবী বাটীর ভৃত্যকে আলোকসহ পলাশবনে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু নিজের লোক কেহ সঙ্গে না থাকিলেও পথে লোকের বড় একটা অভাব হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে ভক্তেরা প্রত্যহই পলাশবনে উপস্থিত হইত।

জননীদেবী একদিন পলাশবনে আসিয়া আমার গৃহ দেখিয়া গেলেন। গৃহ ও স্থানটি দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জননীর সহিত পরিচিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী জননীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। আমারও সেইদিন গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। জননীদেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। আমিও যথাসময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে সেই দিবস যাপন করিয়া যার পর নাই পুলকিত হইয়া থাকিবেন; যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ সেই স্থানের, গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের এবং সর্ব্বোপরি গোস্বামীপত্নী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিবাসিনী বগলাপিশীকে বলিতে লাগিলেন,

"যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি। যেমন মুখের গড়ন ও শ্রী,

তেমনি স্বভাব,—আহা, কেমন শান্ত, শিষ্ট, সদানন্দ। দেখ্‌লে, চোখ জুড়োয। আমি যতক্ষণ ছিলুম, ছেলেটি আর মেয়ে দুটি এক দণ্ডের তরেও আমার কাছছাড়া হয় নি। বড় মেয়েটির নাম যোগমায়া। যোগমায়া তো যোগমায়াই বটে, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। রূপ যেন উছ্‌লে পড়্‌চে। মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। মেয়ের বাপ মা দেশ ছেড়ে এখানে আছে; আর এই বনজঙ্গলের দেশে ভাল পাত্রও পাওয়া যাচ্চে না, তাই বিয়ে হ'তে এত দেরী হ'চ্চে। মেয়ের মা এর জন্যে কত ভাবনা চিন্তে করছিল। মেয়েটিকে দেখে আমার দেবুর কথা ভাব্‌ছিলুম; কিন্তু আমার কেমন দুরদেষ্ট, দেবু আমার যেন সন্নিসি হ'য়ে গেছে! এই দেখনা, সে কত লেখাপড়া শিখেছে, যেন বিদ্যের একটা জাহাজ। কিন্তু দেবু চাক্‌রী বাক্‌রী কর্‌লে না; চাক্‌রী কর্‌লে সে আজ একটা মস্ত বড় চাকুরে হ'তে পার্‌তো। আমার আর দুটি ছেলে তোমাদের আশীর্ব্বাদে বড় বড় চাক্‌রী কচ্চে, আর বৌ ছেলে নিয়ে সুখে আছে; কেবল দেবুই আমার কেমন এক রকম হ'য়ে গেল! দেখ, তার কোন বিষয়ে সক্ নেই, কারুর সঙ্গে আমোদ করা নেই, আহ্লাদ করা নেই, দুটো কথা বলা নেই, একটা ভাল কাপড় পরা নেই, যেমন তেমনেই সন্তুষ্ট—আর কি এক রোগ হ'য়েচে, দিন নেই রাত নেই, পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াচ্চে, আর কেবল বই পড়্‌চে, আর একলা আছে, আর বিয়ের নাম কর্‌লে তেলেবেগুণে জ্বলে উঠ্‌চে। কেন যে দেবু এমনতর হ'ল, তা তো আমি জানি না। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন। দিদি, আমার সব সুখ হ'য়েও কিছু হয় নি। দেবু আমার বড় আদরের সামিগ্রী; দেবুকে আমার সংসারীর মতন দেখে গেলে আমি সুখে মরতে পারতম; কিন্তু সে সুখ আমার কপালে নেই!"

এই বলিয়া জননীদেবী নিরস্ত হইলেন। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। আমি যদিও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া নিশ্চিত দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল; যেহেতু বগলাপিশী তৎক্ষণাৎ আমার আচরণের উপর কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "দেখ্, বৌ, তুই কাঁদিস্ নে। তোর কিসের কষ্ট যে, তুই চোখ থেকে জল ফেলিস্? বল্লে তুই রাগ কর্‌বি, তাই বলি নি; তা নইলে আসল কথা বল্‌তে গেলে, দেবুর তো আমি তত দোষ দিই না। তার আর দোষ কি? যত দোষ তার বাপের। এ কথা তোমার কাছে বল্‌চি, আর সকলের কাছেও বল্‌বো। সত্যি কথা বল্‌বো, তার আর ভয় কি? আমরা যখন বিয়ে দিতে বল্লুম, তখন ছেলের বিয়ে দেওয়া হলো না। বাপ ছেলেকে নাই দিয়ে দিয়ে তালগাছে তুলে ফেল্‌লেন। এখন ছেলে ধিঙ্গী হ'য়ে বনের মাঝে একটা ঘর ক'রে ব'সেচে। আর ছেলেরই বা তোমার এ কি রীত গা? বাপ মা রইলেন এখানে, ছেলে রইলেন ওখানে; এ কোন্ দেশের কথা গা? ছেলে তোমার বিদ্যের জাহাজ, তা নেই মান্‌লুম; কিন্তু দেশে কি আর কারুর ছেলে লেখাপড়া জানে না? আর সকলের ছেলেই কি লেখা পড়া শিখে সন্নিসি হ'য়ে বেড়াচ্চে? এই ধর না তোমারই কথা। তোমার নৃপেন আর সুরেনও তো তোমার দেবনের চেয়ে কিছু কম লেখাপড়া জানে না; কই তারা কি বৌ ছেলে ফেলে কৌপীন প'রে উদাসীন হ'য়েচে? আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি, ছেলের বাপ্‌ই ছেলেকে এমন ক'রেচে। কিন্তু যাক্ ও সব কথা—এখন একটা কথা আমার মনে হ'চ্চে। গোস্বামীর মেয়ে যোগবালা—না—কি নাম বল্লে?—ঐ মেয়েটি ডাগর আর প্রতিমার মত সুন্দরী বল্‌চো। আমার বেশ মনে ধ'র্‌চে, ঐ মেয়েই দেখো তোমার

বৌ হ'বে। তুমি আজকালকার ছেলেগুলোকে তো চেনো না, ভাই। ওরা এক ধারার ছেলে; সোজা পথে তো কখনও যাবে না! স্পষ্ট ক'রে বল্লেই তো হ'তো যে, ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তবে বিয়ে ক'র্‌বো, তা নইলে ক'র্‌বো না। এত মার পেঁচে কাজ কি বাবা? হুঁঃ—, তোমার দেবন আগে ঐ মেয়েটাকে দেখে' যদি পলাশবনে ঘর না ফাঁদিয়ে থাকে, তবে আমার নাম বগলা সুন্দরীই নয়। বনে জঙ্গলে বেড়ানো আমরা আবার বুঝি না? দেখো, ঐ যোগবালাই তোমার বৌ হ'বে, এ কথা আজ আমি ব'লে যাচ্চি, আর তুমিও মনে রেখো। যখন আমার কথা সত্যি হবে, তখন বোলো।” এই বলিয়া বগলাসুন্দরী গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; জননী দেবীও তাঁহাকে কি বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত সদর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। বগলাসুন্দরী এবং জননী দেবীও হয়ত মনে করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রামগ্ন হইয়াছি। কিন্তু আমি শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া বগলাসুন্দরীর এই অদ্ভুত বক্তৃতা গলাধঃকরণ করিতেছিলাম এবং তাঁহার অন্তর্যামিতা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের বিচিত্র পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম। তদ্দণ্ডেই বগলাসুন্দরীর সম্বন্ধে জননীদেবীকে দুই একটী কথা বলিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইল; কিন্তু আমি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া সে রাত্রিতে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না। বগলাসুন্দরী যে সমাজে আছেন, সে সমাজে বাস করা বা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা যে কিরূপ সহজ ব্যাপার, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। ক্রোধে ও অভিমানে হৃদয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিলে, সকলেরই হৃদয় এইরূপ ব্যথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের কেমন স্থিতিস্থাপক গুণ, কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষুদ্রমনা বগলার উপর আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ রহিল না। নিরক্ষরা, নির্ব্বুদ্ধি, প্রগল্‌ভা, বৃথাভিমানিনী বগলার যে এইরূপ স্বভাব হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যোগমায়ার সহিত কোনও দিন আমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই কন্যা লাভের উদ্দেশ্যেই যে আমি পলাশবনে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বকধার্ম্মিকের ন্যায় বসিয়া আছি, এ কথা অতীব নীচ, ঘৃণিত ও অসত্য। কথা যখন অসত্য, তখন আমার ক্রোধের আর কারণ কি? আমার মনের যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ জানেন; তিনি জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যেহেতু আমি আমার চিন্তা ও কার্য্যকলাপের জন্য একমাত্র তাঁহারই নিকটে দায়ী। বগলা যদি অন্যরূপ জানে, তাহাতে আমার তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে

সংসারের প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরকে ভুলিয়া লোকে অসত্যের কিরূপ সেবা করে, তাহাও মনে হইতে লাগিল। শেষে সাধু-চরিত্র মহাপুরুষগণের কথা মনে পড়িল। জগতের উপকার করিতে গিয়া কত মহাপুরুষকে যে কত গ্লানি, নিন্দা, অযথা দোষারোপ ও নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তো কীটানুকীট, কোন্ ছার। পরার্থের কথা দূরে থাকুক, আমি তো স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার সন্তপ্তমন কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইল। কিন্তু আমার বিবাহ বিষয়ে জননীর উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। নানা-কারণে, সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না।

প্রভাতে উঠিয়া পলাশবনে যাইতে যাইতে আমার বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপ চিন্তা মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিত। আমি বেশ বুঝিতাম, বিবাহ করিলে পিতামাতা উভয়েই অত্যন্ত সুখী হন এবং পিতামাতাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন, পিতামাতা পুত্রের উপর প্রীত হইলে, দেবতারাও তাহার উপর প্রীত হন। বিবাহের প্রতি আমার যে কোন বিদ্বেষ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত, বিবাহের জন্য আমার তাদৃশ আগ্রহ বা আস্থা ছিল না। আমি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়। শান্তিতে কালযাপন করাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। সচ্চিন্তা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা এবং সাধ্যমত লোকের উপকারসাধন,—এইগুলিই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলির চরিতার্থতা সম্পাদনোদ্দেশে আমি দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করিয়াছিলাম; প্রথমতঃ, অবিবাহিত থাকা; দ্বিতীয়তঃ, উদরান্নের সংস্থান করা। এই কারণে আমি বিবাহ

করিতে কোন মতেই সম্মত হই নাই এবং উদরান্নের সংস্থানের জন্যও এই পলাশবন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমার উপার্জ্জনের উপর কেহই নির্ভর করেন না; সুতরাং আমার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়কেই আমি প্রচুর এবং এমন কি অতিরিক্তও মনে করিযাছিলাম। বিবাহ করিলে পাছে আমার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, ইহাই আমার প্রধান ভয় ছিল। স্ত্রী হয়ত বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন প্রকৃতির হইবে। যাহা আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা হয়ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে না। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, মনের মিলন না হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। স্বামী স্ত্রীর যদি মনের মিলন না হয়, তবে সে সংসারে আর শান্তি কোথায়? আমি ইচ্ছা করিয়া এই অশান্তি ও দুঃখ ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ইচ্ছা করিয়া কয় জন স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে? তাহার পর, যদি মনের মিলনও হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইতে পারে। পরিবার বৃহৎ হইলে, এত অল্প আয়ে তাহাদের লালন পালন, সুশিক্ষা-সাধন ও বিবাহাদি প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থা ঘটিলে, অন্ততঃ প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনের জন্যও, আমায় চাকুরী হউক বা ব্যবসায় হউক, কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। তাহা হইলে, আমার আর কি হইল? আমি তো আর নির্ব্বিবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইব না? সর্ব্বোপরি, সংসারের অনিত্যতা, প্রিয়জনবিয়োগ এবং সংসারের পাপময় কোলাহল আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বড় বিভীষিকা দেখাইত। এই সমস্ত কারণে আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ জীবনে বিবাহ করিব না, ইহাই এক প্রকার স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং বিবাহের চিন্তা হইতে আমি মনকে যথাসাধ্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে অন্যদিকে

প্রধাবিত করিতাম। সেই কারণে, বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে বড় একটা উদিত হইত না। হইলে, তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভগবৎ-পদে নিয়োজিত করিতাম। বলিতে লজ্জা কি, যোগমায়াকে দেখিয়া এই দুর্ব্বল হৃদয়ে কখন কখন বিবাহের চিন্তা সমুদিত হইত। কিন্তু সহসা তৎক্ষণাৎ কি-জানি-কাহার বজ্রগম্ভীর রবে আমি কম্পিত হইয়া উঠিতাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের মহাভাব ও মহালক্ষ্য আসিয়া আমায় আছন্ন করিত। আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া সেই মহাভাবে নিমগ্ন হইতাম, এবং সেই মহালক্ষ্যপথে অদম্যতেজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে নববল ও নবোৎসাহ সঞ্চিত করিতাম।

বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনের এইরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনক জননী বিবাহ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ থাকিতেন। বিবাহের প্রস্তাবে আমি বিরক্ত হই, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা অনেক দিন এ বিষয়ে আর কোনও কথা উত্থাপন করেন নাই। তাহা দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, হয়ত কাল-ক্রমে তাঁহারা আমাকে উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবেন। এই বিশ্বাসে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনপথ নির্দ্দেশে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু গত রাত্রিতে জননীদেবীর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পলাশবনে যাইতে যাইতে মনে বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিলাম না। বিবাহের প্রসুপ্ত চিন্তাগুলি জাগরিত হইয়া আমার মনকে বড়ই আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে পিতামাতার সুখসম্পাদন, অপরদিকে আমার অবশ্যম্ভাবী পতন—এই দুইটী কঠোর সমস্যার মধ্যে মনের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্রমিক ঘাত প্রতিঘাতে মন নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি কোন সুচারু সিদ্ধান্তেই

উপনীত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে হতাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত মনে এক বৃক্ষের তলে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় আমার অজ্ঞাতসারে নিমীলিত হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই আমি প্রাভাতিক মারুতহিল্লোলে,সেই সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিতাবস্থায় একটী ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন গৃহে জননীর সন্নিধানে বসিয়া আছি। কিন্তু জননীদেবী রুগ্না ও রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও নিষ্প্রভ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কালিমাময়। রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অগ্রজ ভ্রাতারা গৃহে আগমন করিয়াছেন; জননীদেবী আমাদের সকলকেই তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া কঠোর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যেন সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কখনও তাঁহার শুষ্ক গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার সংজ্ঞা-লুপ্তপ্রায় হইতেছে। জননীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আমি যার পর নাই কাতর হইলাম। হৃদয় শোকে অবসন্ন হইল, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল এবং চতুর্দ্দিকে যেন ঘোর অমঙ্গলজনক

উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কালরজনী মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদের সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাহারও মুখে একটীও বাক্য নাই; সকলেই বিষণ্ণ, নীরব ও শোকপীড়িত। সকলেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত এবং সকলেই অসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। কালবৈশাখী অপরাহ্নে, ভীম ঝঞ্ঝাবাত বহিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা ঘটে, আমাদের গৃহেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। শোকমেঘে গৃহ অন্ধকারময় হইল; ঘোর বিপদাশঙ্কারূপ তড়িৎ প্রকাশে আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ও শিহরিত হইতে লাগিলাম এবং করালকালের ভীষণ হুঙ্কাররূপ গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে সকলে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। জননীর শেষাবস্থা দেখিয়া আমি শোকাবেগ আর সংযত করিতে পারিলাম না; সকলের নিবারণ সত্ত্বেও ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহান্তরে গমন করিলাম।

সহসা আমি আহূত হইলাম। আহ্বান শুনিবামাত্র আমি জননীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। সকলে আমাকে জননীর সমীপে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কাতর-স্বরে ডাকিলাম "মা"। মা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং আমাকে আরও নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিয়া সাশ্রুলোচনে ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বাবা—আমার—উদ্—দাসীন—হইও না—আম্—মি—তোর সুখ্ দেখ—লুম—না—আম্—মি তোর বিয়ে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইল। হতভাগ্য আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

সহসা বোধ হইল, কে যেন আমায় তুলিয়া ধরিল এবং "জল, জল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি যেন ঈষৎ সংজ্ঞা লাভ করিলাম এবং একবার চক্ষুও উন্মীলিত করিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম

না। আমার মস্তক যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং আমি যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে চেতনা সঞ্চার হইবার উপক্রম হইলে, আমি যেন কাহার ভয়সূচক কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটী কোমল বালিকা-কণ্ঠও উৎকণ্ঠাসূচক স্বরে যেন বলিয়া উঠিল "দিদি, ভাল ক'রে বাতাস দে, বাতাস দে।" তৎপরেই আমি যেন মুখ-মণ্ডলে অঞ্চল-বিধূনিত মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালন অনুভব করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই চক্ষু খুলিলাম; খুলিয়াই দেখিলাম—কেশব ও উপরি-ভাগে নিবিড় হরিৎপত্র রাজি! কেশবের উরুদেশে আমার মস্তক রক্ষিত রহিয়াছে, এবং আমার মস্তক ও কপোল বহিয়া জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে! ভাবিলাম এ কি? আমি কোথায়? এখানে আমায় কে আনিল? জননীর সদ্য মৃত্যুচ্ছবি তখনও আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান; তখনও শোকোত্থিত উষ্ণ নিশ্বাস আমার নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠপুটে স্ফুরিত হইতেছিল। তাই সহসা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কেশব আমায় বাধা দিয়া বলিল, "আপুনি একটুকু থির হয়ে থাক, ওরূপ ধড় ফড় করবেন নাই। এমন ক'রে একলা এখানে শুয়ে থাক্‌তে হয়?" স্বপ্নের ঘোর তখনও আমায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্ত আমি কেশবের বাধা অতিক্রম পুর্ব্বক উঠিয়া বসিলাম। বসিয়াই দেখিলাম, আমি পলাশবনে আমার গৃহের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এবং আমার সম্মুখে যোগমায়া, সুশীলা ও ভূদেব—অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্তারা এক একটী পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার হস্তে দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলাম। আ ছিঃ ছিঃ, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত

এবং অপ্রতিভও হইলাম। ভাবিলাম, এই বালক বালিকারা আমায় স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিতে দেখিয়া নিশ্চিত কেশবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এরূপ প্রকাশ্যস্থলে শয়ন করাটা ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, উপস্থিত দুরবস্থা হইতে কোনও রূপে মুক্তি লাভের আশায় আমি একটু হাস্যের অভিনয় করিয়া যোগমায়া ও সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলাম "তোমরা বুঝি ফুল তুলে ফিরে আস্‌বার সময় আমাকে এই গাছের তলায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে ভয় পেয়েছিলে; তাই বুঝি কেশবকে ডেকে এনেছো?" যোগমায়া ব্রীড়ায় চক্ষুদুটী অবনত করিয়া আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না; কিন্তু সুশীলা আমার কথার যেন প্রতিবাদ করিয়া বলিল "তা কেন? আমরা বনে ফুল তুলে এই পথে বেরিয়ে আস্‌চি, আর দেখ্‌লুম, আপনি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চেন, আর এক একবার হাত ছুড়্‌চেন, আর ফুকুরে ফুকুরে কেঁদে উঠ্‌চেন! তাই না দেখে, দিদি আর আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। ভূদেব আপনার কাছে গিয়ে 'দেবেন বাবু, দেবেন বাবু' ব'লে দু তিন বার ডাক্‌লে। কিন্তু আপনার কোনই সাড়া পেলে না। আবার আপনি 'মা মা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাই দেখে, আমি ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলুম; কিন্তু দিদি বল্লে 'ওরে থাম্, যাস্‌নে; কেশবকে ডেকে আনি।' তাই আমরা তিন জনে দৌড়ে গিয়ে কেশবকে ডেকে আন্‌লুম। ভূদেব দৌড়াতে দৌড়াতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সুশীলার সরল হাস্য দেখিয়া আমারও হাসি পাইল। সুশীলা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "ভূদেব যেমন পড়েচে, অমনি ওর সাজিশুদ্ধ ফুল মাটীতে উল্টে গেছে; আমি বল্লুম 'ওরে আর কুড়োস্ নে, আর কুড়োস্ নে, তোর ফুল ঠাকুর পূজোয় আর লাগ্‌বে না।' কিন্তু ভূদেব আমার কথা না শুনে, ঐ দেখুন, সব ফুল কুড়িয়ে এনেচে।"

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিতে লাগিল। বেচারা ভূদেব সুশী-লার উচ্চহাস্যে অপ্রতিভ হইয়া যোগমায়ার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর-হৃদয়া সুশীলা তাহাতেও বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে ভূদেব, দেখিস্, আমাদের সাজির সঙ্গে তোর সাজি ঠেকাস্ নে, তা হ'লে সব ফুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ভূদেবকে বিপন্ন দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। সুশীলার মুখে তাহার পতনের কথা শুনিয়া আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই ভূদেব, তোমার তো কোথাও লাগে নাই?" ভূদেব স্ফূর্ত্তির সহিত মাথা নাড়িল। আমি বলিলাম "আহা, তোমার ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে গেল!" ভূদেব তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল "নষ্ট হ'বে কেন? আমি এই ফুলে আমার নিজের ঠাকুর পূজো ক'রবো।"

ভূদেবের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া ভূদেবের দিকে মুখ ফিরাইল। সরলপ্রাণা সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "দেবন বাবু, ভূদেবের ঠাকুর দেখেচেন? একটা মাটীর পুতুল! মা ওকে পুতুলটো খেলা ক'র্‌তে দিয়েছিলেন; ভূদেব সেইটেকে ঠাকুর বানিয়ে রোজ রোজ পূজো করে। নিজের খাবার থেকে কিছু রেখে দিয়ে ঠাকুরকে তারই ভোগ দেয়, আর মাকে, আমাকে আর দিদিকে পেরসাদ দেয়।"

সুশীলার কথা শুনিয়া ভূদেবের মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "না, সুশীলা তুমি জান না; ভূদেব সত্যিকার ঠাকুর পূজো করে।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িবার ইচ্ছায় সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, তোমরা কেশবকে ডেকে আন্‌লে; তার পর কি হ'লো?" সুশীলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কেশব বলিল

"আজ্ঞ্যা, আমি আস্তে দেখ্‌লাম, আপনি অত্যন্ত ঘাম্‌চো, হাত মাথা লাড়্‌চো, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌চো, আর এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চো। তাই দেখে আমার বড় ডর পেলেক্‌। আমি তুমাকে তিন চারবার ডাক্‌লাম; গালাড়া দিলাম; কিন্তু কোন জবাব দেওয়া দূরে থাকুক, আপুনি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লে। তাই দেখে আমি যোগমায়াকে ব'ল্‌লাম 'দিদি ঠাকুরাণ, আমাদের ঘর থেকে শীগ্‌গী এক ঘটী জল লিয়ে আস্‌তে পার?' দিদি ঠাকুরাণ জল আন্‌লে আমি সেই জল তুমার মাথায় ও মুখে দিলাম; আর দিদি ঠাকুরাণ আঁচল দিয়ে তুমাকে বাতাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেক্‌। খানিক পরেই আপুনি জেগে উঠ্‌লে; যাই হোক্‌, ভাগ্যে তো দিদি ঠাকুরাণ আজ এইদিকে ফুল তুল্‌তে আইছিল, আর আমাকে ডেকে দিয়েছিল; তা না হ'লে কি হ'তোক্‌?" এই বলিয়া কেশব আমাকে তিরস্কারমিশ্রিত নানা প্রকার উপদেশের কথা বলিতে লাগিল।

যোগমায়াকে গমনোদ্যতা দেখিয়া আমি সুশীলাকে বলিলাম "সুশীলা, তুমি তো আমায় দেখে ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ুচ্ছিলে; ভাগ্যে তো তোমার দিদি ছিল, তাই কেশবকে এখানে ডেকে এনেছিল। আজ যোগমায়া না থাক্‌লে হয়ত আমার কোন বিপদ ঘট্‌তো?"

সুশীলার মুখখানা একটু গম্ভীর হইল। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল "কেন? আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে ব'লতুম, আর বাবা এসে আপনাকে দেখ্‌তেন?"

সুশীলার কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার পর তাহার ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়া একটু কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলাম "গত রাত্রিতে আমি ভাল ঘুমুতে পারি নাই, তাই এই গাছের তলায় শু'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম;

আর এই ভাবে শু'য়ে থাক্‌লে বড় কুস্বপ্নও দেখ্‌তে হয়। সে যাই হোক্, আমাকে দেখে তোমরা যে বড় ভয় পেয়েছিলে, এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কেশবকে ডেকে এনে তোমরা যে আমার উপকার ক'রেচো, তা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। গোস্বামী মশাই মহাত্মা ব্যক্তি; তাঁর পুত্রকন্যাদের এইরূপ উপযুক্ত কাজই বটে। আমি আজ্‌কের এই ঘটনার কথা গোস্বামী মশাইকে স্বয়ং ব'লে আস্‌বো। মাও এই কথা শুনে যার পর নাই আনন্দিত হবেন। ভগবান্ এইরূপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করেন। তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন।" এই বলিয়া আমি ভূদেবকে বলিলাম "ভূদেব ভায়া, তুমি কিন্তু পড়ে যাওয়াতে আমি বড় দুঃখিত হ'য়েচি। আর ফুলগুলি——" আমার কথা শেষ না হইতে হইতে আনন্দময়ী সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া আবার, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ভূদেব বোধ করি বেগতিক দেখিয়া এবং তাহার যে কোথাও লাগে নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য, সাজি-হস্তে ঘরের দিকে দৌড় মারিল এবং খানিক দূর গিয়া আমার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল "দেবন বাবু, এই দেখুন, আমার কোথাও লাগে নাই।" এই বলিয়া আবার দৌড় মারিল। সুশীলা হাসিতে হাসিতে তাহার দিদির সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং "ওরে, দৌড়িস্‌নে রে, থাম্; আবার প'ড়ে যাবি" এই কথা বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সুশীলা যত চীৎকার করে, ভূদেব তত দৌড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ধীরে ধীরে চক্ষুর অদৃশ্য হইল।

যতক্ষণ তাহারা নয়নগোচর হইতেছিল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টিতে এই কৌতুক দেখিতেছিলাম এবং তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছিলাম্। দেবরূপিণী যোগমায়ার দেব-হৃদয়ের কথা মনে করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আসিল এবং তাহার উপর আমার

শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সরলপ্রাণা সুশীলার কথা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবশিশু ভূদেবের বীরত্বব্যঞ্জক স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই বালকবালিকাগুলির পবিত্র আকারে আমি যেন দেবরাজ্যের ছায়া দেখিতে পাইলাম। বহুদূরে গিয়া যোগমায়া একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু আমরা একদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া আর ফিরিয়া চাহিল না। তাহারা দৃষ্টি-পথের অতীত হইলে, আমি সানন্দমুখে কেশবের দিকে চাহিলাম। কেশবের মনেও ঐরূপ কোনও চিন্তা হইতেছিল; যেহেতু সে আমাকে বলিতে লাগিল "যেমন আমাদের পুভু, তেমনই পুভুর ছেল্যাগুলি। আহা, পুভুর বড় বেটী যোগমায়াটি যেন সাক্ষেৎ মা লক্ষী। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই বেভার। অহঙ্কার নাই, ঘিন্না নাই, সকলের ছেল্যাকেই কোলে লিচ্চেন, আদর ক'চ্চেন, ঘরকে লিয়ে গিয়ে খেতে দিচ্চেন। এইরূপ করেন ব'লে, আমরা গেরামশুদ্ধা লোক কত ডরাই। বলি, একে পুভু কন্যা, তায় আবার যেন সাক্ষেৎ মা ভগবতী। বাপ্‌রে শূদ্দুরের ছেলে কি ওঁর কোলে উঠ্‌তে পারে? আহা, দিদি ঠাকুরাণের বিয়ার জন্যে পুভু কত ভাব্‌চেন। পুভুর ভাবনা দেখে, আমাদেরও ভাবনা হয়। কিন্তু এক একবার ভাবি, দিদি ঠাকুরাণ চ'লে গেলে, আমাদের পলাশ-বন গেরাম যেন আঁধার হ'য়ে যাবেক্; দিদিঠাকুরাণ যেন গেরামের আল।"

কেশবের এই কথা শুনিতেছি, এমন সময় দেখি, বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে এ সময়ে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল "মা ঠাক্‌রোণ কি জন্য আপনায় শীগ্‌গীর ডাক্‌চেন।" আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জননী আমায় অসময়ে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ভৃত্যকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি অনন্যমনে দ্রুতপাদক্ষেপে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতৃদেব বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব, তাঁহার নিকট আর না দাঁড়াইয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম জননীদেবীও গৃহকার্য্যে নিযুক্তা; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও চিন্তাভারাক্রান্ত; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রোদনও করিয়াছেন, তাহা চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি গৃহের কার্য্যাদি করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার চিত্ত সংলগ্ন নাই। না করিলে নয়, এইরূপ ভাবেই যেন তিনি গৃহ কর্ম্মাদি করিতেছেন। আমি ব্যাকুল-মনে চিন্তিত হৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপারে যার পর নাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইলাম এবং তাঁহাকে বারম্বার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দেওয়া

দূরে থাকুক, আরও রোদন করিতে লাগিলেন এবং আমার মস্তক ও চিবুক স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভ্রাতাদের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অন্য কোনও পত্র আসিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তর হইতে আসিয়া আমায় বলিতে লাগিল "দাদাঠাকুর, তুমি অত উতলা হ'চ্চ কেন? সকলেই ভাল আছে; আজ কোথ্ থেকেও কোন পত্র আসে নি। মা আজ সকাল থেকে উঠে অবধি তোমার জন্যই কেঁদে কেঁদে আকুল হ'চ্চেন। ভোরের সময় স্বপন দেখেছিলেন, তুমি যেন সন্নিসি হ'য়ে কোথায় চলে গে'ছ। ভোরের স্বপন মিথ্যা হয় না কি না; আর মা উঠে তোমায় আজ দেখ্‌তেও পান নি; সেই অবধি কেবল কাঁদ্‌চেন আর কাঁদ্‌চেন। বাপ্‌রে ওঁর কান্না তো আমি আর দেখ্‌তে পারি না। যখন তখন কেবল তোমারি কথা নিয়ে কান্না হচ্চে। বলি, হেঁগা দাদাঠাকুর, তুমি এত লেখাপড়া শি'খেচো; বলি, লেখাপড়া শিখে কি মা'কে এম্নি ক'রেই কাঁদাতে হয়? তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই? দেখ্‌চো না, মা কেবল তোমারই জন্যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছেন? আর মাকে কাঁদিয়ে তোমার সুখ হয় নাকি? থেষ্টানী বিদ্যেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ বাবা! আমরা তো মায়ের চোখে জল দেখ্‌লে একেবারে ম'রে যেতুম। অত কথাতেই কাজ কি? এই ধর না, আমি তো ভগ্নী; আমারই চোখে একটু জল দেখ্‌লে আমার গদাই ভাই যেন অস্থির হ'য়ে যেতো!" মঙ্গলার এই তিরস্কারসূচক বাক্যের শেষ না হইতে হইতে পিতৃদেব অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমিও তাঁহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত-সমস্ত হইলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন "কিসের আবার গোল হ'চ্চে, মঙ্গলা?" মঙ্গলা গৃহ-

মার্জ্জনা করিতে করিতে মার্জ্জনী একবার জোরে আছাড়িয়া বলিল "কিসের আবার গোল! যে গোল চিরদিনই হয়, আজও তাই হ'চ্চে।" এই বলিয়া সে আবার সজোরে মার্জ্জনী সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে তাহার মার্জ্জনী আছাড় খাইতেছিল, তাহা এরূপ পরিষ্কৃত যে, সেখানে একবিন্দু সিন্দুর পড়িলেও অনায়াসে তাহা খুঁটিয়া লওয়া যাইত। মঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া আমি মনে করিলাম, তাহার শক্তি থাকিলে আজ্ সে আমার বিষ ঝাড়িয়া ফেলিত।

পিতৃদেব আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তামাকু খাইতে খাইতে এক-খানা বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং আমাকেও বসিতে বলিলেন। আমি অদ্যকার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অবহিতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন "দেবু, তুমি এতদিন বালক ছিলে; তাই তোমায় কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন বলিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ হইয়াছ। তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হই। দেশ-শুদ্ধ লোক একমুখে তোমার স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞানের প্রশংসা করে। তুমি যে কোনও চাকরী বা কাজকর্ম্ম করিলে না, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই। তুমি যে উদ্দেশ্যে পলাশ-বনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অতীব সাধু এবং আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু আমি কোন মতেই তোমার একটী সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না;—তুমি যে আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, আমার বিবেচনায় তাহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। সংসারী না হইলে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। অতঃপর গৃহী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ভগ-

বানের মহিমা ও কৃপা আরও বুঝিতে পারিবে। তুমি শান্তিপ্রিয়, তাহা আমি জানি। তুমি সংসারের কোলাহল, অশান্তি, বিপদ্ আপদ্ প্রভৃতির কথা চিন্তা করিয়া হয়ত তন্মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিপদ্ আপদের মধ্যে ফেলিয়া থাকেন। স্বর্ণে নিকৃষ্ট ধাতু থাকিলে, অগ্নি দ্বারা তাহা শোধিত হয়; সেইরূপ বিপদ্ আপদের মধ্যে পড়িলে, মানুষের অহঙ্কার অভিমানাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে নির্ম্মল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। বিপদ্, অশান্তি ও স্বজন-বিয়োগের আশঙ্কা করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকা পৌরুষের চিহ্ন নহে, বরং কাপুরুষেরই লক্ষণ। এতদ্দ্বারা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করা হয়। দেখ, সংসারী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। স্থল বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা দোষের না হইতে পারে; কিন্তু তুমি যে সেরূপ স্থল নও, ইহা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ সংসারে তোমাকে সুখই দিন আর দুঃখই দিন, দুইই মাথা পাতিয়া লইবে। সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান নহে। সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। সুখ দুঃখ দুইয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। দুঃখ দেখিয়া ভয় পাইও না; অবশ্যে পলাইবার চেষ্টা করিও না। ভগবান্ না করুন, কিন্তু কখনও যদি তোমার ভাগ্যে দুঃখ বা বিপদ্ ঘটে, তবে তাহা বিধাতার বিধান ও ইচ্ছা বলিয়াই জানিবে। দুঃখে, বিপদে অধীর না হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিবে। তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ; তোমাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটী কথা আমি তোমাকে কর্ত্তব্য-বোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে, তাহা বলিতাম না; কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর মুখ চাহিয়া

আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। তুমি বিবাহ না করায় তোমার জননী যার পর নাই দুঃখিতা। ইনি তোমাকে সংসারী দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিতা হন। তুমি অবশ্যই ইহা জানিতেছ এবং মনে মনে বুঝিতেও পারিতেছ। জননীর সন্তোষ-বিধান করা তোমার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমার বিবেচনায় একটী প্রধান ধর্ম্ম্য কর্ম্মও বটে। পরের মঙ্গল ও সুখ সাধন করা যখন তোমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, তখন গর্ভধারিণী জননীর দিকে চাহিবে না, এ কিরূপ কথা? আত্মত্যাগ না করিলে কখনও পরের উপকার করা যায় না এবং কোনও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহ করিলে যদি তোমার সুখের ব্যাঘাত ঘটে আর তোমার জননীর আনন্দ হয়, তাহা হইলেও তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। নিজে কষ্ট না সহিলে কি কখনও পরের সুখ সাধন করা যায়? কিন্তু বিবাহ করিলে, তোমার সুখের ব্যাঘাতই বা কিসে হইবে? যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার মনোমত না হন, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিবে। সক্রেটীশের কথা তুমি সবিশেষ অবগত আছ; তিনি কি ভাবে কালযাপন করিযাছিলেন, তাহা একবার স্মরণ কর। কিন্তু তোমার তত দূরও আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। আমি তোমার জন্য একটী উপযুক্তা পাত্রী স্থিরীকৃত করিয়াছি। পাত্রীটি তোমারই অনুরূপা এবং সর্ব্বপ্রকারে তোমারই যোগ্যা। বালিকাটিকে দেখিয়া অবধি আমার মনে হইয়াছে, ভগবান্ তাহাকে তোমারই জন্য এবং তোমাকে তাহারই জন্য অভিপ্রেত করিয়াছেন। আর তাঁহার এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই বুঝি তিনি তোমাদিগকে পরস্পরের নিকটে আনয়ন করিয়াছেন। আমি কাহার কথা বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ—গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া।"

এই বলিয়া পিতৃদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আর কি উত্তর দিব? উত্তর দিবার আমার মুখ ছিল না। নিজের সুখান্বেষণ করিতে গিয়া আমি জননীদেবীর সুখ দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই, পিতৃদেবের স্নেহমিশ্রিত এই মৃদু মধুর তিরস্কার বাক্যে আমি যার পর নাই লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইলাম। আমি মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভণ্ড আমি, নরাধম আমি, স্বার্থ-পর আমি—এইরূপেই কি আমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিব? প্রাণ দিলেও যাঁহাদের ঋণের পরিশোধ করা যায় না, বিবাহ করিলে যদি তাঁহাদের যৎসামান্য সন্তোষ সংসাধিত হয়, তবে সে বিবাহ আমি করিব না? তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যোগমায়া যদি নরকের কীটও হয়, তথাপি আমি তাহাকে বিবাহ করিব এবং বিবাহ করিয়া যদি আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক যন্ত্রণাও অনুভব করি, তথাপি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন জগতের আর কেহই তাহা জানিতে পারিবে না! আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া পিতৃদেব বলিলেন "দেবু, তুমি আমার কথায় কি বল?"

আমি বলিলাম "আপনার কথার প্রত্যুত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনার ও জননীর আদেশ ও ইচ্ছা আমার অবশ্য পালনীয়। যোগমায়াই হউক, আর যেই হউক, যাহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তাহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে। কদাপি ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু যোগমায়ার সহিত বিবাহ দেওয়া যদি আপনাদের মত হয়, তবে এক মাস কাল এ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। এক মাস পরে, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন। আমি আপনার নিকট এক মাসের সময় প্রার্থনা করিতেছি।"

পিতৃদেব আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন "আচ্ছা, তাহাই হইবে; আর এক মাস কাল আমিও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কোনও বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ইনি এই এক মাস কাল তোমার কাছে পলাশবনেই বাস করেন। মঙ্গলাও কাছে থাকিবে। ভৃত্য এই বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তুমি কি বল?"

আমি বলিলাম "এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। মা পলাশ-বনে থাকিলে, আমাকে আর নিত্য দুই বেলা এখানে গতায়াত করিতে হয় না।" তাহার পর জননীর দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলাম "কিন্তু মা, গোস্বামী মশাইয়ের মেয়ের সহিত আমার বিয়ের কথা তুমি বা মঙ্গলা কা'কেও ব'লো না, বা জান্‌তে দিও না। যদি এই কথা হঠাৎ রাষ্ট্র হ'যে পড়ে, তা হ'লে ওখানে বিয়ে হওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ হ'বে, তা ব'লে রাখ্‌চি।"

জননী দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন "বাবা, তা কি আমি ব'ল্‌তে পারি? আর তুমি যখন মানা ক'র্‌চো, তখন ব'ল্‌বো কেন?"

মঙ্গলাও বলিয়া উঠিল "দাদাঠাকুর, তুমি বুঝি, আমাকে তাই মনে ক'রেচো। মঙ্গলার পেটের কথা বা'র করে, সংসারে তো এমন কা'কেও দেখি নি।" এই বলিয়া মার্জ্জনী-রঞ্জিত-হস্তা মঙ্গলা দাসী সগর্ব্বে চঞ্চল-পাদবিক্ষেপে অন্যত্র গমন করিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জননীর অনুরোধক্রমে পিতৃদেব ও আমি স্নানের উদ্যোগ করিতে গেলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমি বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় প্রসন্ন হইল। দুই তিন দিন পরে পিতৃদেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন; আমরাও পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে কিয়দ্দিন বাস করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে গ্রামের মহিলারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। প্রায় প্রত্যহই প্রবীণা ও নবীনারা অবসর ক্রমে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে আমি সচরাচর বাটীর সংলগ্ন শালবনে প্রবেশ করিয়া একটী মনোরম স্থানে সুকোমল তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া পুস্তকপাঠে নিমগ্ন থাকিতাম। সেখানে অন্য কোনও জনপ্রাণী আসিত না; কেবল কেশব মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইত মাত্র। সেই দিনের ঘটনা হইতে কেশব আমার গতিবিধির উপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিত এবং বনের মধ্যে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিত।

আমি পিতৃদেব ও জননীদেবীকে যে এক মাস কাল আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কতিপয় বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা গম্ভীরভাবে চিন্তা করি নাই। সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য-পন্থা-নির্ণয়ার্থ একটু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করিয়াছিলাম, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইলে, আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে যাইতে পারিব না এবং যোগমায়াও আমার সাক্ষাতে কদাচ বাহির হইবে না। এইরূপ ব্যাপার যে কোন মতেই আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় কারণ এই যে, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ দিতে জনকজননী মনস্থ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র যোগমায়াকে ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছাটা আমার মনে স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠিল। যোগমায়াকে যে ইতঃপূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা নহে। কিন্তু কি-জানি-কেন সে দেখাটা আমার নিকট যেন "ভাল করি পেখন না ভেল" বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, এই প্রেক্ষণের সুবিধা না ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপ নানা কারণে, পিতামাতার নিকট আমি উক্ত প্রকার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা আমার ঐ প্রস্তাবের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমার দূরদর্শিতার ফল আমি সদ্য সদ্যই দেখিতে পাইলাম। জননী পলাশবনে আসিয়া দুই চারি বার গোস্বামী মহাশয়দের বাটী গিয়াছিলেন; গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীও পুত্রকন্যা সহ দুই চারিবার আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন। তাহার পর, সাংসারিক কার্য্যাদি নিবন্ধন মার কিম্বা গোস্বামী-পত্নীর প্রায়ই

পরস্পরের গৃহে যাওয়া আসা ঘটিত না; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র-কন্যাদের তৎসম্বন্ধে সেরূপ কোনও বাধা বিঘ্ন ছিল না। তাই তাহারা প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর আমাদের বাটীতে আসিত। জননীদেবী তাহাদিগকে তো স্বভাবতঃই ভাল বাসিতেন; এক্ষণে সেই ভালবাসা নানা কারণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বালকবালিকারাও জননীদেবীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তাহারা নিয়তই অমাদের বাটীতে যাতায়াত করিত। যদি কোনও দিন কোনও কারণে না আসিতে পারিত, জননীদেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়নের জন্য মঙ্গলাকে প্রেরণ করিতেন। আমি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে বড় একটা থাকিতাম না। আমি সচরাচর এই সময়ে বনমধ্যে সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়া ওযার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিতাম।

একদিন গ্রামের মহিলারা চলিয়া গেলে, আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পুস্তক গুলি কে অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কেশব পুস্তকগুলি প্রত্যহ ঝাড়িয়া রাখিত বটে; কিন্তু সে তাহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহাদিগকে সাজানো গোছানো দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঙ্গলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মঙ্গলা, আজ আমার বই গুলি কে এমন ক'রে সাজালে?"

মঙ্গলা একটু গম্ভীরভাবে বলিল "যার কাজ, দাদাঠাকুর, সেই সাজিয়েচে।"

আমি বলিলাম "কই, কেশব তো একদিনও এমন ক'রে বই সাজিয়ে রাখ্‌তে পারে না? তবে কি তুই সাজিয়েচিস্?"

মঙ্গলা বলিল "না, দাদাঠাকুর, আমরা কি ওসব কাজ ক'র্‌তে পারি?

ভাল করে ঘর ঝাঁট্ দিতে বল, আনাজ কুটতে বল, বাসন মাজতে বল, কাপড় কাচ্‌তে বল্ল, তা এমন ক'রে ক'রবো যে, কেউ চোখের মাথা খেয়ে একটুও খুঁৎ ধর্‌তে পারবে না। কিন্তু, দাদাঠাকুর, আমরা মুখ্‌খু শুখ্‌খু লোক, আমরা কি তোমার বই গুছিয়ে রাখ্‌তে পারি? যে সংস্ক জানে, ভট্টচায্যির মতন পড়্‌তে পারে, আর লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সে নইলে কি আর কেউ ওসব কাজ ক'র্‌তে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তবে কে সাজালে? মা তো এ ঘরে আসেন নাই? সংস্ক কে জানে? ভট্‌চায্যি কে?"

মঙ্গলা বলিল "তা কি জানি! মা তো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্পেই মত্ত ছিলেন; ওঁর অপ্সর কোথায়? আর অপ্সর থাক্‌লেই কি উনি তোমার বই এমন করে সাজিয়ে রাখ্‌তে জানেন?"

আমি ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলাম "তবে কি ভূতে বই সাজিয়ে গেল?"

মঙ্গলা ভূতের বড় ভয় করিত।

ভূতের নামে সে শিহরিয়া উঠিল; তার পরেই বলিতে লাগিল "আ আমার পোড়া কপাল! ভূতে সাজাবে কেন গো? তোমার কি ধারার কথা গো? ভূতেই এই সব কাজ করে না কি?"

আমি আরও একটু চড়িয়া বলিলাম "তবে কে সাজালে রে, পোড়ার মুখি, তাই খুলে বল্ না?"

মঙ্গলার মুখখানা মেঘের মত হইল। চক্ষু দুটী যেন ছল ছল করিতে লাগিল; সে বলিল "দাদাঠাকুর, তুমি গাল দিচ্চ, দাও; আমি কিন্তু কিছু জানি টানি নে। আমি নিজের কাজেই ব্যস্ত; কে তোমাব বই সাজালে, কে তোমার কি কল্লে, অত শত খবর আমি রাখি নে; আর রাখ্‌বার আমার অপ্‌সরও নেই।" এই বলিয়া মঙ্গলা গমনোদ্যতা হইল।

আমি বলিলাম "বেশ কথা, যাও। কিন্তু দেখো, এঘরে আর একলা এস না। ঐ যে জানালার কাছে চাঁপা গাছটি দেখ্‌চো,—যার ডাল এসে জানালার ভিতর উঁকি মারচে,—ঐ গাছে একটী ব্রহ্মদৈত্যি আছে। সেই মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলি গুছিয়ে টুছিয়ে যায়। আজও ভর্ত্তি দুপুর বেলায় সে নিশ্চয়ই এসে থাকবে। আমি বামুন কিনা; এই পৈতে দেখে কিছু বলে না। কিন্তু তুই সুন্দুরের মেয়ে—খপরদার, এ ঘরে একলা আসিস্ না; একলা দেখ্‌তে পেলেই তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। এইটী বুঝে শুঝে কাজ কর্ম্ম করিস্।"

ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিতে শুনিতে মঙ্গলা ভয়ে চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। বৈকালের সময় সিঁড়ি প্রায় অন্ধকারময় হইয়াছিল। কেশব যে উপরে আসিতেছিল, তাহা মঙ্গলা দেখিতে পায় নাই। ভয়ে তাহার কিছু দেখিতে না পাইবারও কথা। যেমন মঙ্গলা কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, অমনি কেশব আহত হইয়া ক্রোধে তাহাকে এক চড় মারিয়াছে। মঙ্গলা তাহাকে সত্য সত্যই ব্রহ্মদৈত্য মনে করিয়া "বাপ্‌রে ম'লাম রে, বেহ্মদৈত্যিতে খেলে রে," এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিন চারিবার আছাড় খাইয়া নীচের বারাণ্ডায় গিয়া পড়িল। তাহার চীৎকার শুনিয়া জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'লো, মঙ্গলা? কি হ'লো, মঙ্গলা?"

আর কি হ'লো মঙ্গলা! মঙ্গলা কি আপনাতে আপনি আছে যে, সে উত্তর দিবে? মঙ্গলা কেবল চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্দিতে কান্দিতে বলিল "ও, মা গো—আমায় বেহ্মদৈত্যিতে ধ'রে ছিল গো—আমি এখনি ম'রে ছিলুম গো"—

জননী বলিলেন "বেহ্মদৈত্যি কি লো? বেহ্মদৈত্যি কোথায় লো?"

"ও গো, সিঁড়িতে গো!"

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সিঁড়িতে কি লো? এই যে কেশব উপরে যাচ্ছিল! তাঁকেই তো আমি উপরে পাঠালুম! দেখ্, ছুঁড়ি, তুই চোখে দেখ্‌তে না পেয়ে বুঝি তারই ঘাড়ে প'ড়েচিস্?"

মঙ্গলা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল "ওমা, কেশব হ'বে কেন গো? ওমা, বেহ্মদৈত্যিটা যে কালো ঢেঙ্গা মুস্কো জোয়ানটার মতন গো! ওমা, আর একটু হ'লেই যে সে আমার ঘাড়টা মট্‌কে ফেলেছিল গো!"

মঙ্গলার কথা শেষ না হইতে হইতে কেশব নীচে গিয়া বলিল "মা ঠাকুরাণ, সত্যি বটে, আর একটুকু হ'লেই আমি ইয়ার ঘাড়টা মচাড়ে ফেল্‌ত্যাম। ঈ আমার নাকের উপরে এমন জোরে মাথা ঠুকেছিল, যে এখনও নাকটা ঝন্‌ঝনাচ্চে।"

মঙ্গলা তখন দাঁড়াইয়া বলিল "হেঁ রে ছোঁড়া, তুই আস্‌ছিলি, তা আমায় ব'ল্‌তে নেই? আর তোর হাত কি শক্ত রে? হেঁ রে এমনি জোরেই চড় মার্‌তে হয়?—মা গো—আমি তোমায় গড় কর্‌চি গো—তুমি আমায় ছেড়ে দাও গো—আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না গো—বাপরে, আমায় একটা চাকরের হাতেও মার খেতে হ'লো? বগলা ঠাক্‌রোন আমায় এখানে আস্‌তে সত্যিই মানা ক'রে ছিল গো। দাদা ঠাকুরের কেশবা এক বেহ্মদৈত্যি; আবার তার সত্যিকার একটা বেহ্মদৈত্যি আছে গো। সে নাকি জানালার ধারে ঐ চাঁপাগাছে থাকে! মা গো, তোমরা বামুন গো, তোমাদের সে কখনও কিছু কর্‌বে না গো। আমি শূদ্দুরের মেয়ে, সে কোন্ দিন আমারই প্রাণটা বধে ফেল্‌বে গো। সে দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়

এবং তার বই সাজিয়ে দিয়ে যায়। আজ নাই যোগমালা ও আমি বই সাজিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে নিত্যিই বই সাজিয়ে দিয়ে যায় গো। যদি কেশ্‌বার হাতে বাঁচি, তা হ'লে তার হাতে যে রক্ষে নেই গো! হায়, হায়, মা গো—শেষকালে বেহ্মদৈত্যির হাতে আমার মরণ ছিল?" এই কথা বলিতে বলিতে মঙ্গলা দাসীর শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। সে পা ছড়াইয়া, সপ্তমে স্বর তুলিয়া, মৃত জননীকে উদ্দেশ করিয়া দস্তুরমত ক্রন্দন করিতে বসিল। সেই ক্রন্দন-গীতির অনেকগুলি করুণ পদ ছিল; কিন্তু তাহার প্রধান ধূয়ার অর্থ এই প্রকার:—"মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী তাহাকে কি বেহ্মদৈত্যির হাতে মরিবার জন্যই গর্ভে ধরিয়াছিল?"

মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী আজ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্যই আদরিণী কন্যার এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অগত্যা আমার জননীদেবীই মঙ্গলাকে তাহার প্রশ্নের একটা সদুত্তর দিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাহাতে মঙ্গলা দাসীর কণ্ঠস্বর নিবৃত্ত না হইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জননীদেবী অবিচারিতচিত্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

মঙ্গলা বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন থাকায় এতক্ষণ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া দেখিল, তাহার নিকটে কেহই নাই! মঙ্গলা তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন করিতেছিল। ঠিক্ এই সময়ে কেশবচন্দ্র মঙ্গলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "ও মঙ্গলা, তুই অত কাঁদ্‌চ্‌স্ কেনে? বেহ্মদৈত্যি কুথায় যে, তোর ঘার মোচাড়্‌বেক্? বেহ্মদৈত্যি থাক্‌লে আমাকে এত দিন রাখ্‌তোক্ না কি? আমি যে কত দিন একলাই এই ঘরে শুয়েছিল্যাম।"

কেশবকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মঙ্গলা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল "ওরে, ড্যাংপিটে, সর্ব্বনেশে ছোঁড়া, তুই বকিস্‌নে, পালা আমার সাম্‌নের থেকে—ওরে ছোঁড়া, বেহ্মদৈত্যি তোর আর কি ক'র্‌বে ? ম'লে তুইও যে বেহ্মদৈত্যি হবি রে।"

কেশব বলিল, "আচ্ছা, এখন গাল দিচ্চুস্, দে ; বেতেব বেলায় দেখা যাবেক্। হে বেহ্মদৈত্যি ঠাকুর, তুমি সব শুনে রাখ্‌বে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মঙ্গলার বড় ভয় হইল। কেশব চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জননীর নিকট গমন করিল এবং অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল :—"মা, দাদাঠাকুরের শীগ্‌গীর বিয়ে দিবে তো দাও, আমি আর এখানে থাকতে পার্‌বো না। দাদাঠাকুর বউ নিয়ে এখানে থাকুক। আমরা আমাদের বাড়ীতে যাই চল। বন জঙ্গলে আমাদের কাজ নেই ; আমাদের সেই বাড়ীই ভাল। ওগো যেমনি দাদাঠাকুর, বউটীও তেমনি হ'বে দেখ্‌চি। বউ কত লেখাপড়া জানে, সংস্ক জানে, ভট্‌চায্যি ঠাকুরের মতন মন্‌তর পড়ে, আবার দাদাঠাকুরের মতন বনে বেড়া'তেও ভাল বাসে। সে আইবুড় মেয়ে, রোজ রোজ বনে ফুল তুল্‌তে যায়। হেঁগা, বলি, আইবুড় মেয়ের কি যখন তখন ফুলের গাছ ছুঁতে আছে ? ফুলগাছে ঠাকুর দেবতা কত-কি থাকে। কখন্ কি হবে, তার ঠিক্ কি ? এদের কারুর সঙ্গেই আমার ব'ন্‌বে না, বাছা। আবার চাকরটিও তেমনি হ'য়েচে। বাবা বাড়ী এলেই দাদাঠাকুরের শীগ্‌গীর বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি গরীবের বাছা ; কোন্ দিন ভূতের হাতে আমার পরাণটা যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মঙ্গলা চুপ করিল। বোধ হয়, ভূতের হাতে মরণের কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষে আবাব জল আসিয়াছিল।

জননী বলিলেন "তুই ছুঁড়ি কেঁদে মরিস্ কেন? ভূত দেখা দূরে থাক্, ভূতের নাম শুনেই যে ম'লি! দেবুর সঙ্গে তুই লাগিস্, তাইতো দেবু তো'কে ভয় দেখায়?"

মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হেঁ, আমিই লাগি বুঝি? তুমি তো সব জান? আগে বিয়ের নামে জ্ব'লে যেত, এখন একশ বার যোগমালার কথা জিজ্ঞেস করা হ'চ্চে! আমি মেয়ে মানুষ, অত মার পেঁচ কি বুঝ্‌তে পারি? আর ওঁর মত বেহায়াপনাও আমি ক'র্‌তে পারি না।"

আমি দেখিলাম, তামাসা মন্দ নয়। ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলাম "মঙ্গলা।"

মঙ্গলার কণ্ঠস্বর একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই বৃহৎ বাটী খানিতে অনেকক্ষণ আর মানব-কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলাব প্রকৃতিই এইরূপ। মঙ্গলা মিথ্যা কথার একটী বৃহদায়তন ঝুড়ি। মঙ্গলা যাহাকে বুঝিতে পাবে না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার পৃষ্ঠে বিষদন্ত বসাইয়া দেয়। মঙ্গলার দংশনে প্রাণের কোনও আশঙ্কা হয় না বটে, কিন্তু তাহার জ্বালা বড়ই তীব্র এবং সেই জ্বালা ক্ষণস্থায়িনী হইলেও যাব পর নাই অসহ্য। আধ্যাত্মিক অর্থে, বগলা সুন্দরী ও মঙ্গলাদাসী উভয়েই সহোদরা; কেহ কেহ বলেন, যমজভগিনী। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সকলেই ইহাদিগকে ভয় করিত; আমিও করিতাম।

মঙ্গলা যতক্ষণ প্রসন্না থাকে, ততক্ষণ সে মঙ্গলময়ী। কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, সে মূর্ত্তিমতী চণ্ডী। যাহার উপর মঙ্গলার ক্রোধ হয়, সুযোগ পাইলে মঙ্গলার তাহাকে নিজ হলাহল দ্বারা জর্জ্জরিত করিবেই করিবে। কিন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়া গেলে, মঙ্গলা নিজের উপব উৎপীড়ন, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আশঙ্কা কবিতে থাকে। এই

কারণে সে যতক্ষণ অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে আর কিছুতেই শান্তি থাকে না। তোষামোদ, ক্রন্দন, অসরল অপরাধ স্বীকার যেরূপেই হউক, সে অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। মঙ্গলার প্রধান ভয়, পাছে কেহ শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাকে কোনও ভৌতিক ব্যাপারে ফেলিয়া দেয়! মঙ্গলা মৃত্যু অপেক্ষাও ভূতকে অধিকতর ভয় করিত! এই ভূতভীতিই মঙ্গলাকে মানবীর পদে অবিচ্যুত রাখিয়াছিল। নতুবা সে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, অপকৃত ব্যক্তিকে কোনও রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই মঙ্গলার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মঙ্গলা অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া বসিত। এইরূপে প্রায় দেশশুদ্ধ লোকেরই সহিত মঙ্গলার বিবাদ হইত, আবার দুই দিন পরে অক্লেশে সেই বিবাদ মিটিয়াও যাইত। বিবাদ মিটিয়া যাইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে দুইটী চক্ষে দেখিতে পারিত না।

আমাদের গৃহেও মঙ্গলা প্রচুর অশান্তি আনয়ন করিত। মঙ্গলা জনকজননীহীন এবং অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অনাথা হইলে, জননীদেবী তাহাকে আমাদের গৃহে আশ্রয় দেন। সেই অবধি সে আমাদের গৃহে, যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ার ন্যায়, বাস করিতেছে। আমরা কেহই তাহাকে একটী দিনও দাসী বলিয়া ভাবি নাই। জননীদেবী তাহাকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সমস্ত "জ্বালা"ই অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। আমরাও তাহাকে আমাদের ভগিনীর তুল্য মনে করিতাম। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন মঙ্গলা আমাকে মধ্যে মধ্যে তাড়না করিত। আমিও সেই কারণে তখন তাহাকে একটু মানিয়া চলিতাম। এখন আমি বড় হইয়াছি; বড়

হইয়া আমি নিজের ইচ্ছামত কার্য্যাদি করিতেছি। কার্য্যগুলি আমার মনোমত হইলেও, মঙ্গলা অনেকগুলির অনুমোদন করিত না। সেই কারণে, সে আমার উপর মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্টা থাকিত। অসন্তুষ্টা থাকিত বটে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তবে আমার উপর কোনও দিন রুষ্টা হইলে, সে অসাক্ষাতে আমার যথেষ্ট নিন্দা করিত। অদ্যও তাই আমার উপর অপ্রসন্না হইয়া, সে জননীর সমক্ষে একটু বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিল। আমি কিন্তু তাঁহাকে বিষোদ্গীরণ করিতে দেখিলাম; এবং আমি যে তাহা দেখিয়াছি, ইহা তাহাকে জানাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। মঙ্গলা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল। আড়ষ্ট হইবার একটী প্রধান কারণ ছিল—তাহা ব্রহ্মদৈত্যের সহিত আমার তথাকথিত সখ্য বা সাহচর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সে দিন মঙ্গলার মনে ঝড় বহিতে লাগিল। মঙ্গলা আমার নিকট অপরাধিনী ছিল; সুতরাং সে দিন সে আমার আর সম্মুখীন হইতে পারিল না। আমি কিন্তু বাস্তবিক তাহার উপর রাগ করি নাই। এইরূপ একটী না একটী ঘটনা প্রায় নিত্যই উপস্থিত হইত। এমত স্থলে কতই আর রাগ করা যাইবে? মঙ্গলার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি একটী কথা কহিলেই সে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গলা যখন গৃহমার্জ্জন করিতে আমার পাঠগৃহে উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম "কি মঙ্গলা, কাল বড্ড লেগেছিল না কি?"

মঙ্গলা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিল "লাগে নি আবার দাদাঠাকুর? কেশ্‌বা ছোঁড়া এমন জোরে চড় মেরে ছিল যে, আমার গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ ব'সে গেছ্‌ল। আর কাল এমন মাথাও ধ'রেছিল যে

আমি সারারাত্রির মধ্যে একটীবারও মাথা তুল্‌তে পারি নি। আর প'ড়ে গিয়ে আমার হাঁটু টাটুও ছ'ড়ে গেছে। আজ গায়ে ভারি বেদনা হ'য়েচে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িল।

আমার সহানুভূতির উদ্রেক করাই মঙ্গলার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহার অবস্থা দেখিয়াও আমি বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। আমার মনে হইল, মঙ্গলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। গত কল্যই এইজন্য আমার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে অপ্রতিভ হইয়া আমি মঙ্গলার অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলাম "মঙ্গলা, আমি বড় লজ্জিত হ'য়েচি। তুমি যে প'ড়ে গিয়ে এত কষ্ট পাবে, তা আমি ভাবি নাই। যা' হোক্, তুমি কিছু মনে ক'রো না। আর কেশব ছোক্‌রাও বড় গোঁয়ার দেখ্‌চি। লাগ্‌লোই বা তার নাকে। তা ব'লে কি মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে হয়? তুমি কিছু মনে ক'রো না, মঙ্গলা। আমি তাকে সাবধান ক'রে দেবো।"

এই সহানুভূতি বাক্যে মঙ্গলার অশ্রুপাত আরও প্রবল হইয়া উঠিল। নীরবে মঙ্গলা অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল "দাদাঠাকুর, অভাগিনীর উপর কি তোমাকে রাগ ক'র্‌তে হয়? আমি রাগের মাথায় কখন কি ব'লে ফেলি, তার ঠিক থাকে না। তুমি আমার উপর রাগ টাগ ক'রো না। আমার গদাই ভাইয়ের চেয়েও তুমি আপ-নার। তোমরা আছ ব'লে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তা নইলে অকূল-পাথারে আজ কোন্ দিন ভেসে যেতাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকি, তোমরা আমায় পায়ে ঠেলো না।"

আমি বলিলাম "মঙ্গলা, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? আমরা কি কখন

তো'কে কিছু বলি? কাল তুই মা'কে কত মিথ্যে কথা বল্‌লি। ভাবলুম, রাগের মাথায় যা বল্‌চে, বলুক গে। তোর কথায় আমি আদবে রাগ করি নাই।"

মঙ্গলা অম্লানবদনে বলিল "আমি কাল কি বলেচি, দাদা, তা আমার মনে নেই। তুমি কিছু মনে টনে ক'রো না। আমার পোড়া কপাল, তাই আমি তোমাব সঙ্গে হাসি তামাসা ক'র্‌তে গেছ্‌লুম। যোগমায়া আর আমি কাল তোমার বই সাজিয়েছিলুম্। সে সব কথা তোমাকে পরে ব'ল্‌বো মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু তুমি বেহ্মদৈত্যি ঠাকুরের যে ভয় দেখালে!—হেঁ দাদা ঠাকুর, সত্যি এই চাঁপা গাছে ঠাকুর আছে?"

প্রশ্ন করিতে করিতেই মঙ্গলার গায়ে কাঁটা দিল এবং সে করজোড়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম "দূর্ পাগ্‌লি, বেহ্মদৈত্যি আবার কোথায়? ও সব ঠাকুর টাকুর মিছে কথা; আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।"

মঙ্গলা আমার কথায় যেন অবিশ্বাস করিয়া বলিল "না দাদাঠাকুর, তুমি আমায় ভোলাচ্চ।"

আমি বলিলাম "আমি তোকে সত্যি ব'ল্‌চি, চাঁপাগাছে ব্রহ্মদৈত্যি নাই। ভয় ক'র্‌লেই ভয় হয়। আমি তোকে একটী কথা বলে দিচ্চি, সেইটী মনে রাখিস্। যখনই তোর ভয় হ'বে, তখনই তুই ভগবান্‌কে মনে ক'র্‌বি। তা হ'লে আর তোর ভয় হ'বে না।"

মঙ্গলা বলিল "আচ্ছা, রাম নাম্ কর্‌লেও তো ভূতের ভয় হয় না?"

আমি বলিলাম "সে একই কথা। রাম নামই কর্‌বি।"

মঙ্গলা যেন কিছু আনন্দিত হইয়া বলিল "দাদাঠাকুর, তুমি যে আমায় স্নেহ কর ও আমার মঙ্গল ভাব, তাকি আমি জানি না? যোগ-

মায়ার কথা আমি যা যা জেনেচি, তোমায় এক সময় সব ব'লবো। ঐ শোন, মা কি জন্যে ডাক্‌চে, একবার শুনে আসি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "যা"। ভূতের ভয় তিরোহিত হইল, আমিও প্রসন্ন হইলাম। মঙ্গলার আর আনন্দ দেখে কে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়া সম্বন্ধে মঙ্গলা কি জানিয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। জননীর মুখে শুনিলাম, যোগমায়ারা তিন চারি দিন আমাদের বাড়ী আসে নাই। মঙ্গলা তাহাদিগকে ডাকিতে গেলেও যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চায় না। কথা শুনিয়া একটু বিস্মিতও হইলাম। ব্যাপার কি, তাহা অবগত হইবার জন্য একদিন মঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মঙ্গলা, যোগমায়া আর আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তুই আজ তা'দের ডাক্‌তে গেছ্‌লি?"

মঙ্গলা বলিল "এই তো আমি ওদের বাড়ী থেকে আস্‌চি দাদা। যোগমায়া কোন মতেই আস্‌তে চায় না।"

"কেন?"

"তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? ওর মা ওকে আমার সঙ্গে আস্‌তে কতবার বল্লে। কিন্তু সে না এলে আমি কি ক'র্‌বো?"

"তবে তুই কিছু ব'লেচিস্ না কি ?"

আর মঙ্গলা যায় কোথায় ? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র অকপটহৃদয়া মঙ্গলা দাসী কাঁদিয়া দেশ গোল করিবার উদ্যোগ করিল। মঙ্গলা এই তিন চারি দিনের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনোমধ্যে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হয় ত সে যোগমায়াকে আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছে, তাই সে আমাদের বাড়ীতে আর আসিতে চায় না। আর এই কারণেই হয়ত আজ ক'এক দিন তাহাকে গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত পাঠের সময়ও দেখিতে পাইতেছি না। সন্দেহটা উপস্থিত হইবামাত্র মনের ভাব গোপন করিয়া মঙ্গলাকে বলিলাম "তুই মিছেমিছি চেঁচিয়ে দেশ গোল ক'চ্চিস্ কেন্‌, মঙ্গলা ? ভাল চাস্ তো চুপ্ কর্।"

মঙ্গলা কিন্তু নীরব হইল না। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল "তোমার ও কি কথা, দাদাঠাকুর ? আমি কি সে কথা ব'ল্‌তে পাবি ?"

আমি বলিলাম "কি কথা ?"

মঙ্গলা আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বলিল "এই যে, সেই কথা—যে কথা তুমি ব'ল্‌তে মানা ক'রেচো—আমি কি সে কথা কখন পেকাশ ক'র্‌তে পারি, দাদাঠাকুর ? এই সেদিন তুমি আমাকে তোমার বই সাজানো নিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে। কই, আমি তোমাকে কিছু ব'লে ছিলুম ?"

শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী তাহার বাক্য গোপন করিবার শক্তিটি যে আমার উপরেই প্রয়োগ করিবেন, তাহা আমি প্রথমে তত ভাবি নাই। যাহা হউক, মঙ্গলার উত্তরটা আমার নিকট ঠাকুর গৃহে কদলী-ভক্ষণ-সম্ব-

স্বীয় অস্বীকারের ন্যায় বোধ হইল। সন্দেহ ক্রমেই বিশ্বাসে পরিণত হই-বার উপক্রম হইল। মঙ্গলাই যে সেদিন যোগমায়াকে আমার বিবাহের কথা বলিয়া দিয়াছে ও সেই কারণেই যে যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চাহিতেছে না, ইহাই আমার নিকট খুব সম্ভবপর বোধ হইল। আমি কথাটি বাষ্ট্র করিতে তাহাকে ও জননীদেবীকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। মঙ্গলা এই কথা প্রকাশ করিয়া আমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে ; সুতরাং সে যে সহজে সত্য কথা বলিবে বা অপ-রাধ স্বীকার করিবে, তাহা বোধ হইল না। অগত্যা আমিও চতুরতা অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইতে তৎপর হইলাম।

আমি বলিলাম "যোগমায়ার বই সাজানোর কথা তুই আমাকে সেদিন বলিস্ নাই, তা সত্যি বটে। কিন্তু যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বার কথাটা তুই তা'কে ব'লে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারিস্। আর বলাই সম্ভব। যখন আর দু'দিন পরেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে যাচ্চে, তখন বলায় আর দোষ কি ?" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই যোগমায়াকে কি ব'লেছিলি, আর যোগমায়াই না কি ব'ল্লে ?"

আমি যদি গাছের তলে তলে ভ্রমণ করি, মঙ্গলা গাছের আগায় আগায় ফিরিতে থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়াই মঙ্গলা সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দ্দোষিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিস্ময়সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওমা, তোমার কি ধারার কথা গো! ওমা, আমি কোথায় যাব গো! এ সব মিছে কথা তোমায় কে লাগাচ্চে গো! বুঝেচি, পোড়ার মুখো কেশ্‌-বাই আমার উপর বাদ্ সাধ্‌চে!"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে চলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই

তাহাকে বলিলাম "কেশবকে তুই অকারণ গাল দিচ্চিস্ কেন? সে আমায় কিছু বলে নাই। আর ও কথা নিয়ে তোকে অত ব্যাকুল হ'তে হবে কেন? তুই কিছু বলিস্ নাই তো বলিস্ নাই। আর যদি ব'লেই থাকিস্, তাতেই বা কি হ'বে? যাক্—যোগমায়া আমার প'ড়্‌বার ঘরে ব'সে সেদিন সংস্কৃত প'ড়্‌ছিল না?"

"সংস্ক মংস্ক অত কে জানে, দাদা। যোগমায়া তোমার সেই বড় বই খানা টেনে পাতা গুলো উল্টে পাল্টে প'ড়্‌ছিল।"

"ভট্‌চার্য্যি ঠাকুর যে রকম পুঁথি পড়ে, সেই রকম ক'রে পড়্‌ছিল, বল্‌ছিলি না?"

"হাঁ, তা বই কি? আমার তো ভারি হাসি পাচ্ছিল।"

"তার পর? যোগমায়া কিছু বল্লে?"

"বল্লে বই কি। যোগমায়া বই গুলোর দুরবস্থা দেখে, কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌ছিলো। আমি বল্লুম, 'না হয় তুমিই বোন সাজিয়ে দাও। আমি নিজে বই সাজাতে জান্‌লে কি এমন হ'য়ে থাকে?' আমার কথা শুনে যোগমায়া বইগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগ্‌লুম। যোগমায়ার স্বভাবই ঐ রকম; সে কোথাও একটু অপরিষ্কার বা ময়লা দেখ্‌তে পারে না। যোগমায়া যখনই আমাদের বাড়ী আসে, তখনই মা'র বাসন পত্র সাজিয়ে দিয়ে যায়; আল্‌নায় এক-খানি কাপড় বেমানান হ'য়ে থাক্‌লে, তখনি সেটি ঠিক ক'রে দেয়। মা তো যোগমায়াকে দেখে আনন্দে আটখানা হন। মা বলেন, যোগমায়া আমার যেন কত আপনার। যোগমায়া বৌ হবে, এই কথা মনে হ'লে মা'র তো আর আনন্দ ধরে না।"

"আচ্ছা, তা নাই হ'লো। তার পর যোগমায়াকে তুই কি ব'লে-ছিলি?"

মঙ্গলা ঝটিতি আত্মরক্ষায় তৎপর হইল। সে বলিল "ওমা আমি আবার কি বল্‌বো গো? তোমার ঐ এক কি ধারার কথা গো?"

আমি দেখিলাম, মঙ্গলাকে সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবার যো নাই। তাই ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম "আচ্ছা মঙ্গলা, ভেবে দেখ্, আর দুদিন পরেই তো যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যাবে। তখন তো আর কোন কথা ছাপা থাক্‌বে না? সবই জান্‌তে পার্‌বো। তবে আর লুকোচুরিতে কাজ কি? ভাল মানুষের মতন সব কথা ব'লে যা।"

মঙ্গলা আমার কথা শুনিয়া যেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তার পর সে বলিল "দাদাঠাকুর, তবে বলি শোনো; রাগ ক'রো না। আজ কাল্‌কের মেয়েগুলো বড্ড সেয়ানা; মুখ ফুটে কিছু বলে না, তাই। তা নইলে মনের ভাবও বুঝ্‌তে পারা যায় না?"

"আমি বুঝি জানি যোগমায়ার মনের ভাব কি বুঝেচিস্, বল্।"

"কিছু হো'ক্ বুঝেছি।"

"কি বুঝেচিস্, তাই খুলে বল্ না।"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, সুশীলা তোমার কথা উঠ্‌লে 'দেবেন বাবু, দেবেন বাবু' বলে। কিন্তু যোগমায়া কেন একটী দিনও তোমার নাম করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "নাম করে না তো তা'তে কি হ'লো? যোগমায়া আমার নাম ক'র্‌বার কোনও দরকার দেখে না, তাই সে নাম করে না। মিছেমিছি একটা ভদ্রলোকের নাম করায় ফল? সুশীলা ছেলে মানুষ, যার তার কাছে তার ছোট বড় সকল লোকেরই নাম ধ'রে কথা কয়। কিন্তু যোগমায়ার বুদ্ধিশুদ্ধি হ'য়েচে, সে তা ক'র্‌তে যাবে কেন?"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, তা নেই হ'লো। কিন্তু এই কথাটা ধর দেখি। যোগমায়ার সই ঘোষালদের ভাবিনী শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেচে। ভাবিনী তোমার এই বাড়ী তৈয়ের হ'তে দেখে যায় নি; তাই সে এ বাড়ীতে এসে যোগমায়ার সঙ্গে সব ঘর দেখে বেড়াচ্ছিল। তুমি ওপরে আছ মনে ক'রে যোগমায়া ছম্‌ছম্‌ ক'র্‌ছিল। ভাবিনী অনেক বার বলাতেও যোগমায়া ওপরে উঠ্‌তে চায় নি। তাই দেখে আমি বল্‌লুম, 'এস না, ওপরে যাই, কেউ নেই। দাদাঠাকুর এখন ঐ বনের মধ্যে আছে। এখন আর বাড়ীতে আস্‌বে না।' আমার কথা শুনে যোগমায়া আর ভাবিনী ওপরে উঠ্‌লো। আমরা তিন জনেই ওপরের সব ঘর দেখে বেড়াতে লাগ্‌লুম। তোমার প'ড়্‌বার ঘরে এসে যোগমায়া তোমার বইগুলো দেখে কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌তে লাগ্‌লো। [illegible] কথা তো তোমায় ব'লেচি। যোগমায়া আর আমি বই সাজাচ্ছিলুম [illegible] দেখে [illegible] ভাবিনী চাঁপাগাছের ধারে সেই জানালাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে [illegible] দেখ্‌তে লাগলো। সে বন দেখেই আমাকে বল্লে, 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুর কি এই বনের মধ্যেই আছে?' আমি বল্লুম 'হাঁ'। তুমি বনের মধ্যে কি কর, ভাবিনী তাই আমায় জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে; আমি বল্লুম 'পড়ে, শুয়ে থাকে, কত-কি ভাবে।' তাই না শুনে ভাবিনী বল্লে 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুরকে তোমরা বনের মধ্যে গাছতলায় একলা শুয়ে থাক্‌তে দাও কেন? কোন্‌ দিন যে বিপদ হ'বে।' কথা শুনেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম, বল্লুম 'সে কি কথা গো; বিপদ কেন হ'তে যাবে?' ভাবিনী বল্লে 'বিপদ না হ'লেই তো ভাল। আমরা কি আর বিপদ হোক্‌ ব'ল্‌চি। কিন্তু কেশবকে জিজ্ঞেস্‌ করগে দেখি, ভাগ্যে সে দিন আমার সই ছিল, তাই রক্ষে হ'য়েচে।' আমি বল্লুম 'বল কি গো! কই কেশ্‌বা ছোঁড়া তো আমাদের কিছুই বলে নি। কি হ'য়েছিল, তোমরাই বল না, শুনি।'

ভাবিনী সব কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগমায়া তা'কে চোখ্ টিপে দিলে, তাই সে আর কিছু ব'ল্লে না। দেখে শুনে আমার বড্ড রাগ হ'লো। আমি যোগমায়াকে বল্লুম 'অত চোখ্ টেপাটেপিতে কাজ কি ভাই? আর দু'দিন পরেই তো তুমি আমার দাদাঠাকুরের রক্ষক হ'বে, তা আর অত লুকোচুরিতে ফল কি?' কথাটা ব'লে ফেলেই দাদাঠাকুর আমি মুখ সাম্‌লে নিলুম। কিন্তু ভাবিনী বড় চতুর; সে আমায় সব কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌তে বল্লে। আমি কিন্তু কিছু ভাঙ্গ্‌লুম না। তোমার সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল।"

আমি বলিলাম "ভাঙ্গ্‌তে তো বড় বাকী রেখেছিস্! আচ্ছা, যা ক'রেচিস্, ক'রেচিস্। এখন যোগমায়ার মা'রও কাছে তুই কিছু শুনেচিস্ নাকি?"

"যোগমায়ার মাও, দাদা, এই কথা জেনেচে। কিন্তু তাকে যে কে বল্লে, তা আমি জানি না। কথা কতক্ষণ ছাপা থাকে বল? কথা পাঁচকাণ হ'লেই ঢাকের বাদ্যির মতন বেরিয়ে পড়ে। আহা, মাগী কিন্তু বড় ভাল মানুষ। আমি গেলেই আমাকে জিজ্ঞেস্ করে 'হেঁমা, সত্যি তোমাদের কত্তা গিন্নি মত করেচে? আমার কি এমন ভাগ্যি হবে মা? যোগমায়ার ভাগ্যে কি এমন বর ঘট্‌বে মা? এমন তপস্যা কি ও ক'রেচে"—

মঙ্গলাকে বাধা দিয়া আমি বলিলাম "থাক্, থাক্, ঢের হয়েচে। তোকে আর কিছু ব'ল্‌তে হবে না। তুই বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখ্‌গে যা।"

মঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গেল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে আমার পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত পুস্তক-গুলির দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ বাল্মীকি-রামায়ণের উপর আমার

দৃষ্টি পড়িল। মঙ্গলার কথা সত্য হইলে এই পুস্তকখানিই যোগমায়া পাঠ করিয়াছিল। যোগমায়া তবে সংস্কৃত পড়িতে জানে! যোগমায়া তবে এই পবিত্র দেবভাষা বুঝিতে পারে! ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতেছে ও বাল্মীকি বুঝিতে পারিতেছে, ইহা আমার নিকট বড়ই বিস্ময়কর বোধ হইল। মঙ্গলার কথায় সহজে প্রত্যয় হইল না। সন্দেহ নিরাকরণার্থ তাহাকে একবার উপরের ঘরে আসিতে বলিলাম। সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে বলিলাম "যোগমায়া কোন্ বই-খানি প'ড়্ছিল, মঙ্গলা?"

মঙ্গলা বলিল "দাদাঠাকুর, আমি কি সে বই খুঁজে বার ক'র্‌তে পার্‌বো? তোমার সেই ডাগর বইখানা। এই টে!" এই বলিয়া মঙ্গলা বৃদ্ধ বাল্মীকিকেই টানিয়া বাহির করিল।

আমার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আমি মঙ্গলাকে মনে ও মুখে বিস্তর গালি দিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে তিরস্কার মিশ্রিত আব্‌দারের স্বরে বলিলাম "মুঙ্‌লি, পোড়ারমুখি, তুই যদি এখন সব কথা না ভাঙ্গতিস্, তা হ'লে হয় ত কোনও দিন আমার ভাগ্যে যোগ-মায়ার সংস্ক পড়া শোনা ঘট্‌তো। কিন্তু তোর পেটে আর কথা থাক্‌লো না। থাক্‌বেই বা কেমন করে? যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ যে তা হ'লে মিথ্যে হয়ে যায়।"

আমার তিরস্কারবাক্যে মঙ্গলা যেন কিছু ক্ষুভিত হইল। সে বলিল "দাদাঠাকুর, আমার যা দোষ হ'য়েচে, তা তো তোমায় ব'লেচি। আমায় আর বক্‌লে কি হবে? আচ্ছা, তোমায় যদি একদিন যোগমায়ার সংস্ক পড়া শুনিয়ে দিই, তা হ'লে তো হবে?"

আমি বলিলাম "কেমন করে শোনাবি?"

"যেমন করেই হোক্।"

আমি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম "না, আর আমি শুন্‌তে চাই না ; যোগমায়ার সঙ্গে তুই যে কোনও চাতুরী খেলবি, তা আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না। যোগমায়া সরলা ; তার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌লে, তোকেও প্রতারিত হ'তে হবে।"

আমার কথা শুনিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তরে গমন করিল। যাইবার সময় সে নিজ অঞ্চলে ঈষৎ মুখাবরণ করিল। বোধ হইল, আমার ভাব গতিক দেখিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কথা আর ছাপা থাকিল না। এক কাণ, দুই কাণ হইতে হইতে গ্রামশুদ্ধ লোক বিবাহের কথা শুনিল। শুনিয়া অবশ্য সকলে যার পর নাই আনন্দিত হইল। যোগমায়া তো বাড়ী হইতে বাহির হওয়া অনেক দিন বন্ধ করিয়াছিল; আমাকেও বাধ্য হইয়া গ্রামের মধ্যে গতাগাত বন্ধ করিতে হইল। সকলেই আমার মতি গতির প্রশংসা করে, যোগমায়ার রূপ গুণের কথা পাড়িয়া প্রাচীন উপমাটির উল্লেখ করে এবং গোস্বামী মহাশয়ের চিন্তাভার লাঘবের কথা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। গ্রামবাসীদের ভাবে প্রকারে ইহাই বোধ হইতে লাগিল, যোগমায়াকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আমি শুধু গোস্বামী মহাশয়কে নহে, যেন তাহাদিগকেও চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিতেছি! দেখিলাম, বিষম বিপত্তি! এই বিপত্তিতে পড়িয়া আমি গৃহ হইতে আর বহির্গত না হইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা দেখিলাম না। সময়ে অসময়ে গ্রামের বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়ারা দলে দলে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জননীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বালিকা প্রৌঢ়াদের কথা দূরে থাকুক, অবগুণ্ঠনবতী যুবতীরাও অকুতো-ভয়ে ও দুর্জ্জয় সাহসে দ্বিতলে উঠিয়া আমার পাঠগৃহে উঁকি মারিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিত্য আমায় দেখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও দিদৃক্ষা অসম্ভবরূপে বলবতী হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, বাড়ীতে তো তিষ্ঠান ভার। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের বনবাসই শ্রেয়স্কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমি কতিপয় দিবস প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত বনের মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম; কেবল আহারাদির প্রয়োজন বশতঃই এক একবার বাড়ীতে আসিতাম মাত্র। কিন্তু বন সর্ব্বক্ষণ ভাল লাগিবে কেন? স্বেচ্ছায় বনবাস, আর অনিচ্ছায় বনবাস, ইহাদের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কি করি, আর কাহাকেই বা দুঃখের কথা বলি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন কোনও প্রয়োজনবশতঃ বনরূপ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সশঙ্কচিত্তে, মৃদুপদ-সঞ্চারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, সৌভাগ্য-ক্রমে সেখানে কোনও প্রতিবাসিনী রমণী নাই; কেবল জননীদেবী মঙ্গলাকে লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে একাগ্রচিত্তে কলাইয়ের বড়ি দিতেছেন। আমি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বড়ি দেওয়ারূপ কার্য্যটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং বাল্যকালে এই সদ্যজাত অশুষ্ক বড়ি ভক্ষণে কেন এত অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত তদ্বিষয়েও চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই নিকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা হইতে গর্ব্বিত মন মহাশয় শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আমি জননীদেবীকে একটী কথা বলিবার অভিপ্রায় করিতেছিলাম; সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিলাম—"মা, বড়ি তো দিচ্চ, আমার একটী কথা শুনবে?"

জননী অমনি বড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া পিষ্ট কলাই হস্তে ব্যাকুলনেত্রে

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি কথা বাবা? তোমার আবার কথা শুন্‌বো না?"

আমি বলিলাম "বেশী কিছু নয়; বলি, আমাকে কি এত শীঘ্রই বনবাস কর্‌তে হ'বে?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মা চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন "বনবাস কি রে? বনবাস তুমি কেন কর্‌তে যাবে, বাবা? শত্রুকেও যেন কখনও বনবাস কর্‌তে না হয়!"

আমি বলিলাম "তা তো ঠিক্ কথা! কিন্তু আমার যে সত্যি সত্যিই বনবাস হ'য়েচে। তুমি কি কোন খবর রাখ? কেবল না'বার খাবার সময়েই তুমি আমাকে বাড়ীতে দেখ্‌তে পাও; তারপর সমস্ত দিনটা যে আমি কোথায় থাকি, তা কি তুমি জান? তুমি তো বড়ি দিতে, আর কলাই ভাঙ্গতে, আর বিয়ের উদ্যোগ ক'র্‌তে ভোর থেকে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাক। আমার কোন খোঁজ খবর রাখ কি? আমি যে বাড়ীতে দুই দণ্ড তিষ্ঠিতে পার্‌চি না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল বনবাসই আশ্রয় ক'রেচি। যদি বিয়ের আগেই বনবাস ক'র্‌তে হলো, তবে বিয়ে আর কে ক'র্‌বে?"

"কেন বাবা, কি হ'য়েচে? তুমি বাড়ীতে থাক না কেন? তোমাকে তো সত্যি আমি সমস্ত দিন দেখ্‌তে পাই না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌তে হ'লে, কোথাও খুঁজে পাই না। তুমি বনের মধ্যে একলা কেন থাক, বাবা? আমি তো তোমায় অনেক দিন মানা ক'রেচি?"

আমি বলিলাম,—"তা তো ক'রেচো, সত্য। কিন্তু আমি যে পাড়ার মেয়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হ'লুম। যারা বার মাস ত্রিশ দিন আমায় দেখ্‌চে, তারাও যে ওপরে উঠে আমার ঘরে উঁকি মার্‌চে! বলি, হাঁ মঙ্গলা, বিয়ের কথা হচ্চে ব'লে আমার চেহারা খানারও কিছু পরিবর্ত্তন

হ'য়েচে না কি? পাড়ার মেয়েগুলো আমায় দেখবার জন্যে এত উঁকি ঝুঁকি মারে কেন, তা ব'লতে পারিস্?"

বস্! আমার কথা শেষ না হইতে হইতে মঙ্গলা দাসী হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিল "যত দোষ, নন্দ ঘোষ! পাড়ার মেয়েরা ওপরে উঠে ওঁকে দেখ্তে যায় কেন, তারও কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে। মা বুঝ্তে পারচ দাদাঠাকুরের কথা? আমিই যেন ওঁকে বনবাসী ক'রেচি। আমিই যেন পাড়াশুদ্ধ মেয়েকে ডেকে 'এনে ওঁর ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্চি। জানি নে আমার উপর বাদ সাধচে কোন্ পোড়ার মুখো! মা গো, তুমি শীগ্গীর আমাদের ও বাড়ীতে চল; আমি এখানে আর থাকতে পার্‌বো না। হেঁ গো, এক মাস হ'য়ে গেল, বাবা যে এখনও বাড়ী এলেন না! আজকে যে চিঠি এসেচে, তা'তে বাবা কি লিখেচে গো?"

চিঠির কথা শুনিয়া মা বলিলেন "সত্যি তো! কই চিঠিখানা তুই দেবুকে দিস্ নেই? তোকে যে দিয়ে আস্তে বল্লুম?"

"বল্লে তো, কিন্তু বনের ভিতর কে একলা যাবে, বাবা? কেশ্‌বা ছোঁড়াও সেই যে কখন হাটে গেছে, এখনও তো ফিরে আসে নি! আমি ঐ বালিশের নীচে চিঠিখানা রেখে দিয়েচি।"

আমি বলিলাম "বেশ করেচো। আহা, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে কি আর ভূ-ভারতে আছে? দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়!"

এতক্ষণ গর্জ্জন হইতেছিল, অতঃপর সত্য সত্যই বর্ষণ আরম্ভ হইল।

আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। মা বলিলেন "কি লিখেচেন?"

আমি বলিলাম "সংবাদ ভাল; বাবা কাল সকালে এখানে এসে পৌঁছিবেন। সঙ্গে বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছেলেরা আস্‌চে। বড় দাদা

এখন ছুটী পাবেন না, সুতরাং তাঁরই কেবল আসা হ'চ্চে না। মেজ দাদা বিয়ের কাছা কাছি কিছুদিনের ছুটী নিয়ে আস্‌বেন। আর যতীনও আস্‌বে। কিন্তু মাসীমাকে আন্‌তে এখান থেকে লোক পাঠাতে হ'বে। দেখ মা, বাবা বুঝি সেখান থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধে গোস্বামী মশাইকে চিঠিপত্র লিখেছিলেন? এই শোন না, বাবা কি লিখ্‌চেন:—'শুভ পরিণয় কার্য্য যাহাতে এই ফাল্গুন মাসেই সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত জিদ্‌ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমারও বিবেচনায়, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। তোমার গর্ভধারিণীকে বলিবে, তিনি যেন উদ্যোগ আয়োজন করিতে তৎপর হন। আমিও শীঘ্র যাইতেছি, ইত্যাদি।'"

বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে রৌদ্র উঠিল। অশ্রুনয়না মঙ্গলা এই শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিয়া উঠিল "দাদাঠাকুর, তুমি আমায় দোষ দিচ্ছিলে? এই দেখ না, বাবাই ওদের পত্র লিখেচেন! তাই তো আর যোগমায়া আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে চায় না!"

আমি মঙ্গলাকে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নীরব হইতে বলিলাম এবং তৎপরেই বলিলাম "তুই ব'কে মরচিস্‌ কেন? এখন শীগ্‌গীর বড়ি দেওয়া শেষ ক'রে, ঘর দুয়োর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্‌গে যা। বৌদিদিরা আস্‌চে,—যতীন আস্‌চে—জানিস্‌ তো যতীন ধুলো ময়লা দেখ্‌তে পারে না—আবার যতীনের মুখ খেয়ে ম'র্‌বি?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল "ইস্‌, আমার যতীন ভাই তেমন ছেলে নয়, যতীন আমাকে বড় বোনের মতন ভক্তি করে। যেমন মাসী মা তেমনি যতীন। যাই হো'ক্‌, তুমি সত্যি ব'লেচো, আমার ঢের কাজ আছে। মা, তুমি বাপু একলাই বড়ি দেওয়া সাঙ্গ কর। আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখিগে। বৌরা কেউ এই বাড়ীখানা দেখে যায় নি।

আমার কোন দোষেব জন্যে যদি তারা এই বাড়ীর নিন্দে করে, তবে তা ভাল দেখাবে না, বাছা। দাদাঠাকুর, কেশব এলে তুমি তাকে ডেকে বাইরের ঘর আর উঠোন পরিষ্কার কর্‌তে ব'ল্‌বে। আমি ভেতরের সব দেখ্‌চি। ওগো, তুমি কল্‌কেতা থেকে যে ছবিগুলো এনেচো, সে গুলো ওপরের নীচের ঘরে টাঙ্গিয়ে দাও না? কখন আর টাঙ্গাবে? আমি সব নিকিয়ে পুছিয়ে ঠাকুর ঘরের মতন পরিষ্কার ক'র্‌বো। মঙ্গলার যে কেউ দোষ ধ'র্‌বে, তা তো প্রাণ থাক্‌তেও সহ্যি হবে না, দাদা।" এই বলিয়া মঙ্গলা বড়ি দেওয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি পিষ্ট কলাইয়ে লেপিত থাকিলেও বাম হস্তে মার্জ্জনী ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালন করিতে গমন করিল।

জননী-দেবীর অবশ্য আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী এবং ভগিনী-পুত্র আসিতেছে শুনিয়া তিনি বড়ি দিতে দিতেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি মঙ্গলার উপদেশক্রমে উপরের ও নীচের ঘরে যথাস্থানে ছবিগুলি টাঙ্গাইবার উদ্যোগ করিতে গেলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৌদিদিরা তাঁহাদের পুত্রকন্যা ও দাসীদের সহিত পিতৃদেবের সমভিব্যাহারে পলাশবনে উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্রও আসিল। আবার যথাসময়ে মাসিমা ও রাজুদিদিও (আমার মাসতুতো ভগিনী) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় দাদার কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা নীরদা ও মেজ দাদার পুত্রদ্বয় চুনী ও মতির আনন্দ কোলাহলে গৃহ সর্ব্বক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার উপর গ্রামের বালক বালিকা ও যুবতী প্রৌঢ়াদের নিয়ত গমনাগমনে ও কথোপকথনে গৃহ যেন হাটে পরিণত হইয়া উঠিল। আমার তো আর গৃহে তিষ্ঠিবার যো ছিল না। আনন্দময়ী মেজ বৌদিদি অবসর ও সুযোগ পাইলেই বিদ্রূপ ও উপহাস দ্বারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। আমি তাঁহার ভয়ে আমার বনরূপ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলাম। যে দিন তাঁহারা পলাশবনে আসিলেন, সেই দিন গৃহে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাকে কিরূপ অপ্রতিভ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

মেজ বৌ দিদি আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "তবে ঠাকুরপো, আমাদের কিসের জন্যে নেমন্তণ করা হ'য়েচে? বলে ছিলে না, এজন্মে কখন বিয়ে ক'র্‌বে না? মনে আছে, আমি বলেছিলুম, বেঁচে থাকি তো দেখ্‌বো। আমার কথা সত্যি হ'লো কি না দেখ। বলি, ক'নে মনে ধ'রেচে তো? কোথায় ক'নের বাড়ী? আমরা একবার দেখ্‌তে পাব না?"

আমি বলিলাম "এত ব্যস্ত কেন, বৌ দিদি? আগে ব'স, ঠাণ্ডা হও; দুদিন থাক; তার পর বিয়ে হোক্। বিয়ে হ'লে যত ইচ্ছে, তত দেখো।"

"ও ভাই, তোমার কথায় আমি ভুল্‌চি না। বিয়ে হ'লে, আমরা বুঝি আর ইচ্ছেমত দেখ্‌তে পাব। আমাদের বুঝি আর কাজকর্ম্ম নেই। আর তখন আমরা দেখ্‌বো, না তুমি দেখ্‌বে? উঁহুঁ, তা হ'বে না। বলি, ও মঙ্গলা ঠাকুর্‌জি, তুই বুঝি ক'নেকে এনে রাখ্‌তে ভুলে গেছিস্। আমরা যে আস্‌চি, তা বুঝি তুই মনের মাথা খেয়ে ভুলে গেছিস্?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল "আস্‌তে তর নাই ভাই, গাল্ দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে? দেখ্‌চি, বিয়ে বাড়ীতে আমাকে আর লুচিমণ্ডা খেয়ে পেট ভরাতে হ'বে না। তোমার গাল্ খেয়েই আমার পেট ভ'রে যাবে! কিন্তু সত্যি ব'ল্‌চি, ভাই, তোমার গাল্ লুচিমণ্ডার চেয়েও মিষ্টি। আজ অনেক দিন তোমার গাল্ খাই নি। বলি, বৌ দিদি, আমাদের কি এমনি ক'রেই ভুলে থাক্‌তে হয়? দাদাঠাকুর তো বেশ ভাল আছে?"

"ভাল আছে বই কি? এই এল ব'লে; দুদিন পরেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবি। এখন তুই ক'নে আনার কি কচ্চিস্ বল্ দেখি? শীগ্‌গীর গিয়ে একবার ক'নেকে ধ'রে নিয়ে আয়। ক'নেকে বল্‌গে যা, ঠাকুর্‌পো একবার দেখ্‌তে চেয়েচে।"

আমি বলিলাম—"বল কি, বৌ দিদি? তুমি যে মুস্কিল ক'র্‌লে?"

"মুস্কিল কিসের? আমরাই বুঝি একলা দেখ্‌বো, আর তুমি চোখ্ বুজে থাক্‌বে! তোমার দেখাই দেখা; আমরা তো কেবল চোখেই দেখ্‌বো; তুমি যে চোখে ও মনে দুইয়ে মিলিয়ে দেখ্‌বে!"

"তা তো আমি অনেকবার দেখেচি আর নিত্যিই দেখ্‌চি। এখন তুমি দেখ্‌তে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা।"

"আচ্ছা তাই হ'বে। আমরাই দেখ্‌বো, কিন্তু দেখো, ভাই, ক'নে এলে তুমি যেন উঁকি ঝুঁকি মেরো না। আমি মঙ্গলা ঠাকুর্‌ঝিকে কড়া-কড় পাহারা দিতে ব'লে দেবো। ঠাকুর ব'ল্‌ছিলেন, তুমি ঐ বনের মধ্যে কোন্ খানে দিন রাত ব'সে থাক; তুমি সেইখানেই যাও। আঁ আমার পোড়া মন,—ঠিক্ কথাই তো, তুমি যে আজকাল বনের মানুষ বনমানুষ হয়েচো। তোমার আবার ক'নে দেখা কি? তুমি কতক-গুলো বই নিয়ে সেইখানে শুয়ে শুয়ে পড়গে, যাও।"

"ইস্, বৌ দিদি যে ভারি পণ্ডিত হ'য়ে এসেচো, দেখ্‌চি।"

"হব না কেন? যার ঠাকুরপো পণ্ডিত, তার বৌ দিদি পণ্ডিত হ'বে না?"

"ঠাকুরপো তো বনমানুষ, ঠাকুরপোর মতনই বুঝি বৌদিদি পণ্ডিত?"

"তা কাজেকাজেই। এখন মঙ্গলা ঠাকুর্‌ঝি, তুই ক'নে আন্‌তে যাচ্চিস্?"

মঙ্গলা বলিল "যাব না কেন? এই চল্লুম। কিন্তু ক'নে যদি আসে, তা হ'লেই তো? আজ পনর দিন সাধ্যিসাধনা ক'রে তাকে তো একটীবারও এ বাড়ীতে আন্‌তে পাল্লুম না।"

"আচ্ছা, তুই ক'নেকে ব'ল্‌গে যা, আমাদের এখানে জুজুর ভয় নেই। আর জুজু থাক্‌লেও, দিনের বেলায় সে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তবে তার আর ভয় কিসের? তাকে আরও বলিস্, সে যে সম্পর্কে আমার

বোন্ হয়! যোগমায়ার মা যে আমার হরপিসীর সাক্ষেৎ জা রে! আমি ঠাকুরের কাছে যোগমায়ার বাপের কথা শুনে তখনি সব সম্পর্ক ব'লে দিয়েছিলুম।"

মঙ্গলা বলিল—"বটে? সত্যি না কি?" কিন্তু সংবাদ শুনিয়াই সে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "ও মা, মা, আর শুনেচো; যোগমায়া যে আমাদের মেজ বৌ দিদির কি রকম বোন হয় গো!"

জননী তো মঙ্গলার কথা তিন চারি বারেও শুনিতে পাইলেন না। মতি তাঁহার কোলে চাপিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। জননী দেবী তাহাকে জোর করিয়া কোলে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সে কোনমতেই কোলে থাকিবে না। মতির চীৎকারে, মঙ্গলার উচ্চস্বরে ও জননীর ভর্ৎসনা শব্দে গৃহখানি শব্দায়মান হইতেছিল। আমিও সুযোগ বুঝিয়া মেজ বৌ দিদির বিদ্রূপবাণ হইতে মুক্তি লাভের আশায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিয়াই দেখি, নীরদা ও চুনী ভিত্তিবিলম্বিত চিত্রপটগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম "নেরো, চুনী, ভাল আছিস্?"

আমার স্বর শুনিয়াই দুইজনে দৌড়িয়া আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল এবং অতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিল "কাকাবাবু, আমাদের একবার ঐ বনের মধ্যে নিয়ে চল না। যতীনকাকা ওর মধ্যে বেড়াতে গেল; আমরাও যাচ্ছিলুম, কিন্তু যতীনকাকা আমাদের যেতে দিলে না; বল্লে, বিকেল বেলায় তোদের নিয়ে যাব। কাকাবাবু, তুমি এখনি একবার আমাদের বন দেখিয়ে নিয়ে এস না?"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

নীরো ও চুনীর নানা প্রকার অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি তাহাদিগকে বনের কিয়দংশ দেখাইয়া লইয়া আসিলাম। পরে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে দেখিতে পাইলাম, একটী ছায়াসমন্বিত মনোরম স্থানে, কতিপয় পুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে, এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে, যতীন্দ্র ভায়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। যতীনকে দেখিয়াই বলিলাম "কি যতীন, বাড়ীতে না গিয়ে সোজাসুজিই যে বনের মধ্যে ঢুকেচো! মুখ হাত ধুলে না, স্নান কল্লে না, কিছু খেলে না?"

যতীন বলিল "এই যাচ্চি; এখনও তত বেলা হয় নাই; আর একটু দেরী হ'লেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু যা হো'ক, দাদা, বড় সুন্দর জায়গাতেই আপনি বাড়ী ক'রেচেন। আমি তো এমন মনোরম স্থান কোথাও দেখি নাই। এতবার এ দেশে এসেচি, কই একবারও তো পলাশ-বনটা দেখে যাই নাই। এত নিকটে যে এমন স্থান থাক্‌বে,তা তো আমি একটী দিনও ভাবি নাই। আমি ঐ পাহাড়টার উপরে উঠেছিলাম। আহা, ওর উপর থেকে কি সুন্দরই শোভা! একটী ছোট নদী ওর তলে ব'য়ে যাচ্চে। আমি সেই নদীটি ধ'রে বনের মধ্যে অনেক দূর বেড়িয়ে এলাম। আমার তো এখান থেকে উঠ্‌তে মন যাচ্চে না।"

"হাঁ. জায়গাটি খুব মনোরম বটে; তুমি এখানে কিছুদিন থাক? তোমার সঙ্গে দিনকতক খুব সুখে কাল কাটানো যাবে। এখানে আমায় বড় একলা একলা ঠেকে। কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পাই না; কেবল মাঝে মাঝে বই পড়ি আর এদিক্ ওদিক্ বেড়িয়ে বেড়াই। তোমাদের বি, এ, পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয় নাই?"

"না; শীগ্‌গীর বেরুবে। পাশ হ'বার তো অনেকটা আশা করি। তবে এখন কি রকম হয়, তা বল্‌তে পারি না।"

"হ'বে আর কি? ভালই হ'বে। এখন চল, বাড়ী যাওয়া যাক্।

এই ছেলেগুলো এসে অব্ধি এখনও কিছু খায় নাই। আর তুমিও কিছু খাবে চল।"

যতীন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া আমার সঙ্গে চলিল।

পথিমধ্যে কেশবের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল "মহাশয়, আমি তো তুম্নাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হলাম। ঘণ্টা খানেক তুমার, যতীনবাবুর ও এই ছেলে ছুটীর তল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্চি। ইনারা এখনও কিছু খায় নাই। আর মা কিসের তরে তো আপনাকে ডাক্‌চেন। মঙ্গলা বল্লেক্, তিনি উপরে আপনার পড়্‌বার ঘরটাতে বসে আছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলাম। পড়িবার ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে মা নাই; কিন্তু এক ঘর মেয়ে ছেলে। মেজ বৌদিদি, বড় বৌদিদি, তাঁহাদের দাসীদ্বয়, আমাদের শ্রীমতী মঙ্গলা, প্রতিবাসিনী দুই একটী নবীনা, ভূদেব, সুশীলা, ভাবিনী ও যোগমায়া! সর্ব্বনাশ! সব মেজ বৌদিদির চাতুরী! আমাকে দেখিয়াই মেজবৌ, বড়বৌ হাসিয়া উঠিলেন। মঙ্গলা ও দাসীদ্বয়ও সেই হাস্যে যোগদান করিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া চম্পট দিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; কিন্তু মেজবৌদিদি আমার ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "আ ঠাকুরপো, যাও কোথায়? এমন শোভা দেখ্‌তে মন যায় না? একবার চোখ খুলে দেখ দেখি! কেবল বন জঙ্গল আর পাহাড় দেখে কি কখন এমন চোখ জুড়োয়? এই দেখ না, খোকাবাবু (মতি) এরই মধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেচে। যোগমায়াকে দেখে খোকা বল্লে—'মা এ কে?' আমি বল্লুম—'তোর কাকী মা।' খোকা বল্লে 'কাকী মা? মা, আমি কাকীমার কোলে তাপ্‌বো।' এই দেখ না, খোকা বাবু সেই অবধি তার কাকীমার কোল দখল ক'রে

বসেচে। ছেলে নারায়ণ, আপনার লোক দেখেই চিন্তে পেরেচে।—বলি ঠাকুরপো, তুমি তো আর মেয়েমানুষ নও; তুমি এত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

আমি বল্লুম "নীরো ও চুনীকে বন দেখাতে নিয়ে গেছ্লুম।"

বৌদিদি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যোগমায়াকে বল্লিল—"ও ভাই, তুমিও একবার চোখ দুটী তোল দেখি। ঠাকুরপো আমার বন-মানুষ নয়, জুজুও নয়; কার্ত্তিকের মতন ছেলে। বিদ্যের জাহাজ। এক দণ্ডের তরেও যে তুমি এঁকে চোখের আড়াল ক'র্‌বে না, তা তো বুঝ্‌তেই পাচ্চি। এখন একবার আমাদের সাম্‌নে ওঁকে শুভদর্শন কর দেখি? দেখে একবার আমাদের পোড়া চোখ জুড়িয়ে যাক্‌।"

আমি বৌদিদির হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতেছিলাম না। সহসা এই সময়ে পিতৃদেবের আহ্বান শুনিতে পাইলাম।

পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র, বৌদিদি হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমিও যেন হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং তদ্দণ্ডেই ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচে পলাইয়া আসিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহবাড়ীতে আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় সকলেই আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিলেন না কেবল বড় দাদা ও বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ। বড়দাদা ছুটি পান নাই বলিয়া আসিতে পারিলেন না। আর সত্যেন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিল না। সত্যেন্দ্র না আসাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তাহার উপর আমার একটু অভিমানও হইল। কিন্তু তাহার পত্রখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সে বাধ্য হইয়াই আসিতে পারিল না। আজ প্রায় ছয় মাস কাল সত্যেন্দ্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছে; তাহার শরীর এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তারেরা তাহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাই সে এক বৎসরের অবকাশ লইয়া কিছুদিন এলাহাবাদে ও কিছুদিন অন্যত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সত্যেন্দ্র অবকাশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে। এখনও

প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ হইলেই সে এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সত্যেন্দ্রের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। সুরমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা বার্ত্তা স্থিরতর হইয়া আছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের শরীর অসুস্থ এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমারও জননী-বিয়োগ হওয়াতে, তাহাদের বিবাহ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত আছে। যাহা হউক, সত্যেন্দ্র বিবাহবাড়ীতে উপস্থিত হইতে না পারিলেও, পত্রে হৃদয়ের সহিত নবদম্পতীর সুখ ও মঙ্গল কামনা করিয়াছিল এবং যোগমায়ার ও আমার জন্য যথাযোগ্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিল।

বিবাহের লগ্ন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; অবশেষে একদিন আসিয়া পড়িল এবং যোগমায়াকে ও আমাকে পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিমেষের মধ্যে অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যোগমায়ার সহিত পরিণীত হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যোগমায়া যেন আমার কত কালের পরিচিতা; যোগমায়া যেন আমার কতকালের পরিণীতা পত্নী; যোগমায়া যেন চিরকালই আমার ছিল; তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন যেন কোন্ দূর, সুদূর, স্মরণাতীত যুগে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে; সে গ্রন্থি যেন এখনও তেমনই অটুট ও দুশ্ছেদ্য। ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সবই যেন মায়ার ক্রীড়া, সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেহের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম যোগমায়াতে ও আমাতে যেন কিছু মাত্র প্রভেদ নাই—আমরা উভয়েই অভিন্নদেহ। মনের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই একমন। আত্মার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই অভিন্নাত্মা। আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড! যোগমায়ার সহিত আমার এই বিস্ময়কর মিলন একদিনে—এক মুহূর্ত্তে কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বিবাহের পর বরবধূর বিদায়। কন্যা-বিদায়-রূপ স্বর্ণপ্রতিমা-বিসর্জ্জন-ব্যাপার গৃহে গৃহে নিয়তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন কথা আর কি বলিব? তবে এই স্থলে এই মাত্র উল্লিখিত হইতে পারে যে, কন্যা বিদায় করিবার কালে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সংযতচিত্ত ব্যক্তিও বালকের মত রোদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যখন সকলেই নয়নজলে ভাসিতেছিল, তখন ভূদেব ভায়া বিজ্ঞের ন্যায় আশ্বাসসূচক স্বরে পিতামাতাকে বলিয়াছিল "মা, বাবা, তোমরা কাঁদ্চো কেন? দিদির সঙ্গে আমি যাব। তোমাদের ভাবনা কি?" বালকের এই কথা শুনিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "দুঃখের উপর হাসি" যাহাকে বলে, ভূদেব ভায়া তাহারই অভিনয় করিয়াছিল।

বধূকে লইয়া আমি গৃহে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার মনের সাধ এত দিনে পূর্ণ হইল। তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কতিপয় দিবস আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বগলাপিসীও নিমন্ত্রিতা হইয়া পলাশবনে আসিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই মাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্‌লে বৌ, আমার কথা সত্যি হলো কি না? আমি বলেছিলুম, তুমি দেবুর জন্য ভাবচো কেন? দেবু তো তোমার তেমন ছেলে নয়; অত লেখাপড়া শিখেচে; জ্ঞানমান হ'য়েচে; ও কি কখন তোমার মনে কষ্ট দিতে পারে? আহা, দেবু বড় শান্ত শিষ্ট ছেলে গো। আমাদের সকলকেই বড় ভক্তি করে।"

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম—"তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু, বাপু, আগে যোগমায়াকে দেখে দেবু এই পলাশবনে নিশ্চিত ঘর কাঁদায় নাই।"

বৌদিদিদের জ্বালাতনে আমি সর্ব্বদাই অস্থির হইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাদের বিদ্রূপ-বাণের ভয়ে বনরূপ দুর্গে আর আশ্রয় লইতাম না। যোগমায়াকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথোপকথনি করিবার সুযোগ আমি সর্ব্বদাই খুঁজিয়া বেড়াইতাম। দেখার সুযোগ প্রায়ই ঘটিত; কিন্তু কথোপকথনের সুযোগ বড় একটা ঘটিত না। এই কারণে অনেক সময় বড় ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিতাম।

বিবাহের গোল ক্রমে কমিতে লাগিল। দূরস্থিত আত্মীয় কুটুম্বেরা একে একে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। যোগমায়াও মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে যাইয়া দুই চারি দিবস থাকিত; আবার আমাদের বাটী আসিত। আমি অল্পে অল্পে যোগমায়ার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সে পরিচয়ে প্রথমে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পর আমাদের দেশে প্রেম জন্মে। সুতরাং বিবাহ করিয়াই কেহ বলিতে পারেন না, তিনি দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইবেন কি না। এই সুখ অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত, সকলকেই সংশয়-দোলায় দুলিতে হয়। এই সংশয়ের কালটি বড়ই যন্ত্রণাজনক। তবে আশা এইটুকু মাত্র, সুনিপুণ শিল্পী হইলে আমরা মনোমত দেবতা গড়িয়া লইতে পারি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসী-মা ও রাজু দিদি স্বদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু জননীদেবীর সবিশেষ অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা পলাশবনে আরও কিছুদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। যতীন্দ্র ভায়া তো পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে স্বীকৃতই হইয়াছিল। কিন্তু ভায়াকে গৃহে বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। ভায়া আমার বনের মধ্যে, পাহাড়ের উপরে ও নিকটস্থ কৃষকগ্রাম সমূহে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত এবং নীরো, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি বালকবালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নানা স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়াইত। নীরো ও সুশীলার মুখে আমি তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রতি-দিনই শুনিতে পাইতাম এবং সে বনের মধ্যে বসিয়া তাহাদিগকে পেন্সিলে যে সকল সুন্দর সুন্দর পশু, পক্ষী, পুষ্প ফল, বৃক্ষলতার ছবি আঁকিয়া দিত এবং ছোট ছোট সরল কবিতা লিখিয়া দিত, তাহাও আমি দেখিতে পাইতাম। যতীন্দ্র এইরূপে বাহিরে বাহিরেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইত; প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর মধ্যে বড় একটা আসিত না।

একদিন বৈকালে, আমি পাঠ-গৃহে বসিয়া পাঠে নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে যোগমায়া কি প্রয়োজনবশতঃ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীলা এবং ভূদেবও আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূদেব ও সুশীলাকে দেখিয়া আমি বলিলাম "কি গো, খবর কি?"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "খবর আর কি! এই একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলুম।"

আমি বলিলাম "বেশ ক'রেচো। একশ'বার এসো। আজ যতীনের সঙ্গে তোমরা কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে?"

সুশীলা বলিল "আজ আমরা বেশীদূর যেতে পারি নি। ঐখানে ব'সেছিলুম।"

"কেন? যতীন আজ কি কচ্ছিল?"

"যতীনবাবু আজ আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েচেন, আর ভূদেবের জন্যে একটী কবিতা লিখে দিয়েচেন।" এই বলিয়া সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "কিসের কবিতা? আর কি ছবি? দেখি।"

সুশীলা ছবি ও কবিতা দেখাইবার পূর্ব্বে, হাতের মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া, বলিতে লাগিল "আজ, ভূদেব, তোমার গোলাপ গাছের একটী বড় ফুল তুলে, তার পাপ্‌ড়ীগুলি নষ্ট ক'রেছিল। তাই না দেখে যতীনবাবু বল্লে 'ভূদেব, তুমি ফুলটি নষ্ট ক'রে ভাল কর নি। এস আজ তোমার জন্যে একটী কবিতা লিখে দি।' এই বলে তিনি একটী গাছের তলায় ব'সে এই কবিতাটি লিখ্‌লেন। আমি বল্লুম 'যতীনবাবু, আমায় একটী ছবি এঁকে দাও না?' তাই শুনে যতীনবাবু তোমার ফুলগাছের ও ভূদেবের এই ছবিটী এঁকে দিয়েচেন।" এই বলিয়া আনন্দময়ী সুশীলা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে সেই ছবি ও কবিতাটি দেখাইল।

আমি বলিলাম "বেশ ছবি হয়েছে। কিন্তু ভূদেবের চুলগুলো এই রকম উস্কো খুস্কো না কি?"

সুশীলা ও যোগমায়া ছবি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। ভূদেব অপ্রতিভ হইয়া তাহার বড়দিদির পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

আমি বলিলাম "সুশীলা, ছবি তো দেখ্‌লাম, এখন যতীন কি কবিতা লিখেচে, পড় দেখি, শুনি।"

সুশীলা পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"ফুলের উক্তি

১

ওহে শিশু ভাই,
ভালবাস তুমি মোরে,
কাঁদহ আমার তরে,
একবার মোরে পেলে
নাচ দুই হাত তুলে;
বড় প্রীতি পাই।

২

কিন্তু ওহে যবে,
গাছের ডালেতে বসি'
মনের আনন্দে হাসি,
কেন মোরে তুলে ফেলে
ছিঁড়িয়া আমার দলে,
নাশ হাসি তবে?

৩

ভাই হে তোমার,
হাসিটি কাড়িয়ে নিয়ে,
তার স্থানে কান্না দিয়ে,
যদি কেহ মজা দেখে,
ভাল কি বাসিবে তাকে,
বল দেখি সার?

৪

তবে, ভাই, কেন,
বেচারী ফুলের প্রাণ,
কর তুমি খান খান,
হাসিটি কাড়িয়ে নাও,
তার স্থানে কান্না দাও?
ভাল কিহে হেন?"

সুশীলার মুখে কবিতাটি শুনিয়া আমি সানন্দচিত্তে বলিলাম "যতীন তো বেশ কবিতা লিখেচে, সুশীলা ?"

সুশীলা কিছুই উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যেন ঈষৎ ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, দেবেন বাবু, তবে আমরা যে রোজ ঠাকুর পূজোর জন্যে ফুল তুলি, তা তো দোষ ?"

আমি এ প্রশ্নের যে কি সদুত্তর দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম "ঠাকুর দেবতার পুজোর জন্যে ফুল তোলা দোষের নয়। ফুল তুলে মিছেমিছি নষ্ট করাই দোষ। এই শোন না, আমাদের দেশের একজন কবি কি বলেচেন :—

'কিন্তু রে কুসুম, আর্য্যসুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে ;
সেই সে তোমার ঠিক্ ব্যবহার,
এই কথা আমি ভাবি মনে মনে।
এমন সুন্দর এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল।' "

আমার উত্তর শুনিয়া সুশীলার মুখ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার আর কোনও বিষয় নাই দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"সুশীলা, তোমার দিদির তো একটী বর জুটে গেল,—এখন তোমার একটী রাঙ্গা বর জুটলেই আমরা বড় সুখী হই।"

সুশীলা তাই শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া মৃদু মধুর অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—"কেন, আমি যতীন বাবুকে বিয়ে ক'র্‌বো।"

কথা শুনিয়াই যোগমায়া ও আমি আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে চমকিত

হইয়া উঠিলাম। আমি প্রফুল্লমুখে বলিলাম "অ্যাঁ, যতীন তোমাকে কিছু বলেচে না কি, সুশীলা?"

"বলেচে বই কি? যতীনবাবু আমাকে বল্‌ছিল 'সুশীলা আমায় বে' ক'র্‌বি?' আমি বল্লুম 'ক'র্‌বো'।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যতীনকে তোমার বেশ পছন্দ হ'য়েচে?"

সুশীলা বলিল "হয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র আমি সুশীলাকে সবলে তুলিয়া বারাণ্ডায় বাহির হইয়া বলিলাম "ওমা, ও মাসিমা, ওগো, আর একটী আমাদের বৌ হ'য়েচে গো। সুশীলা যতীনকে বিয়ে ক'র্‌বে ব'লেচে, শুন্‌বে এস।" এই আকস্মিক ও অসম্ভাবিত বিপৎপাতে সুশীলা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার হস্ত-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশেষে কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইয়া, আলুলায়িত বেশে ও বিগলিত-কুন্তলে, হস্ত-হইতে-নিপতিত সেই কবিতা ও ছবিটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবার অবসর না পাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। ভূদেব ভায়া ভগিনীকে কোনও গুরুতর বিপত্তিতে বিপন্না মনে করিয়া তৎপূর্ব্বেই বেগে চম্পট দিয়াছিল। ভায়ার বোধ হয় এইরূপ কোনও নীতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকিবে :—"যঃ পলায়তে, স জীবতি।"

হাসিতে হাসিতে আমাদের তো দেহের বন্ধন খসিবার উপক্রম হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা, মাসিমা, বড়বৌ, মেজবৌ, রাজুদিদি প্রভৃতি উপরে আসিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সেই ছবি ও কবিতা দেখাইয়া সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া মা গালে হাত দিয়া বলিলেন "ওমা, কি আশ্চর্য্যি মিলন গো! এই যে এই মাত্তর দিদির সঙ্গে আমি এই বিষয়ে কথা ক'চ্ছিলুম।"

মেজবৌদিদি তাহা শুনিয়া বলিলেন "মাসিমা, আর কি দেখ্‌চো

বাছা, তোমার ছেলের বে'তে লুচিমণ্ডা না খেয়ে আমরা আর যাচ্চি না।"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তাই হোক্ মা, তাই হোক্ মা; এ ত আনন্দেরই কথা।"

এই গোলমালের সময় বাবা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।
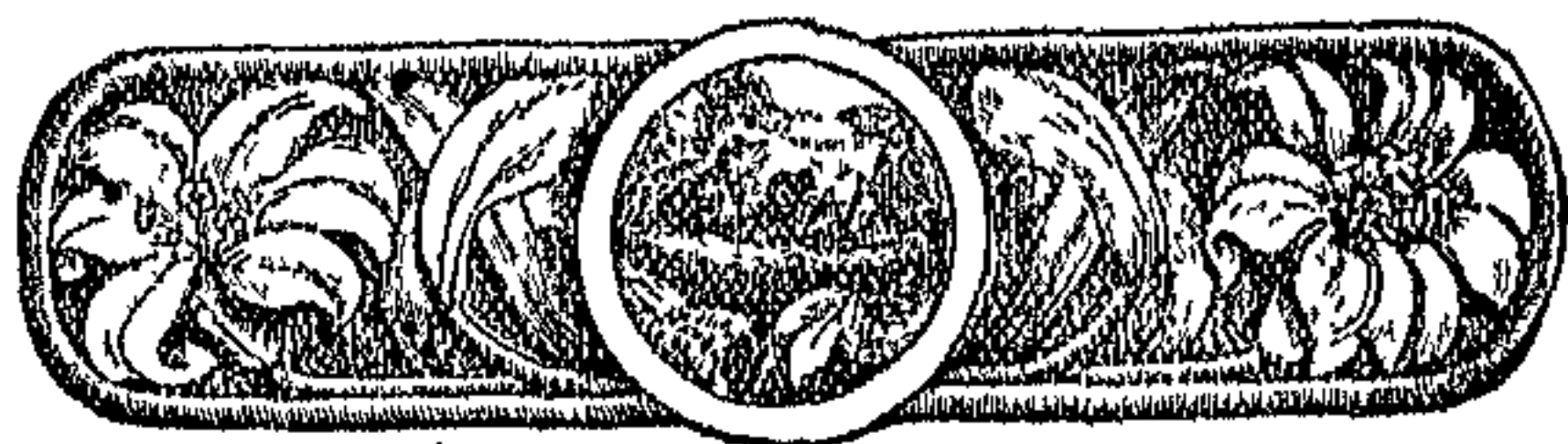
একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেজবৌদিদি যতীন ভায়াকে লইয়া কতিপয় দিবস আবার খুব হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতীন সহজে অপ্রতিভ হইবার ছেলে ছিল না। দুই জনে সমানে সমানে পড়িয়াছিল। একদিন যতীন ও আমি পড়িবার ঘরে বসিয়া সাহিত্যালাপ করিতেছি, এমন সময়ে মেজ-বৌদিদি, যোগমায়ার সহিত, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যতীন যোগ-মায়াকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিবারণ করিলাম, তাহা দেখিয়া মেজবৌদিদি বলিলেন "ঠাকুরপো, তুমি যতীনকে আট্‌কিয়ে রাখ্‌চো কেন? ওর যে সময় নষ্ট হবে।"

যতীন বলিল "কি রকম?"

মেজবৌদিদি বলিলেন "কি রকম! ন্যাকা আর কি! ভাই আমার যেন কিছুই জানেন না! সুশীলা, ভুদেব এসেচে যে! সুশীলার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না?"

"যাব বই কি ? কিন্তু কেবল সুশীলারই সঙ্গে তো আর বেড়াই না। সুশীলা, ভূদেব আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরা সকলেই তো সঙ্গে যায়।"

"তা তো যায় ; কিন্তু সুশীলারই সঙ্গে আজ কাল আসল বেড়ানোটা হ'চ্চে।"

"কি রকম ?"

"কি রকম ! যেন কিছুই বুঝ্তে পাচ্চেন না ! বলি, ছেলেমানুষ পেয়ে ফুস্‌লে ফাস্‌লে বে' ক'র্‌বার যোগাড় করাটা তোমাদের পৌরুষের কাজ না কি ? এই তোমার দাদা তো একটী মেয়েকে ফাঁদে ফেলে নিজস্ব ক'রে ফেল্‌লেন। তুমিও দাদার ভাই কি না, তাই তুমিও আবার আর একটীর যোগাড়ে ব'সেচো।"

আমি বলিলাম "তুমি আমায় এমন কথা বলো না, বৌদিদি ! এই তোমার সাম্‌নেই তো যোগমায়া র'য়েচে। একে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বে' হবার আগে একটী দিনও আমি যোগমায়ার সঙ্গে কখনও কথা ক'য়েছিলাম ? যোগমায়া তো বে' হ'বার আগে কতবার আমাদের বাড়ী এসেছিল ? কই একদিনও আমি যোগমায়াকে দেখেছিলাম ? আমি বনের মধ্যেই তো সমস্ত দিন থাক্‌তাম।"

মেজবৌ দিদি বলিলেন "না, যোগমায়ার সঙ্গে তুমি কোন কথা কও নি ; আর যোগমায়াও তোমার সঙ্গে কোন কথা কয় নি। তা সকলই সত্যি বটে। কিন্তু গাছের তলায় তুমি ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে যোগমায়া এসে তোমায় জাগিয়ে দিত। তোমার মুখ ধোবার জন্যে বাড়ী থেকে জল এনে দিত, আর তুমি ঘাম্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে আঁচল দিয়ে বাতাস দিত। কথা ক'বার দরকার কি ভাই ? কথা নেই বা কইলে ?"

যোগমায়া অপ্রতিভ হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মেজবৌদিদির গা টিপিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তুমি তাই শুনেচো বুঝি ?"

"যাই শুনি ; বলি, এখন নেই তোমাদের বে' হ'য়ে গেছে। যা হ'বার তা তো হ'য়েচে ; এখন আর কেউ তার দোষ ধ'র্‌বে না। কিন্তু যতীন ভাই, তুমি যে সুশীলাকে বে' ক'র্‌বে বলেচো, ফুস্‌লে ফাস্‌লে তার মনটি কেড়ে নিয়েচো, যদি কোনও গতিকে সুশীলার সঙ্গে তোমার বে' না হয়, তা হ'লে তো মেয়েটার মাথা খেয়ে ফেল্‌চো, দেখ্‌চি।"

যতীন বলিল "বে' হবে না কেন ? এক শ বার হ'বে ! আমি সুশীলাকে বে' ক'র্‌বো ; আর সুশীলাও আমাকে বে' ক'র্‌বে, বলেচে।"

"কিন্তু ছেলেমানুষের মন, যদি তার মন ঘুরে যায় ?"

"যায় তো যাবে ; তার জন্যে আর ভাবনা কি ? আমার মন তো ঠিক্ থাক্‌লেই হ'লো। সুশীলা যদি বে' কর্‌তে চায়, আমি পেছ্‌পা হ'ব না।"

"বেশ, বেশ। খুব কবিতা লিখ্‌তে শিখেছিলে, যাই হো'ক্। তোমার মতন আর গোটা কতক কবি এ অঞ্চলে থাক্‌লে, দেখ্‌চি আইবুড়ো মেয়েদের মা বাপকে পাত্র খুঁজে খুঁজে আর হায়রান্ হ'তে হ'ত না। বেশ ভাই, শীগ্‌গীর বে'টা ক'রে ফেল ; আমরাও দেখে যাই। আমাদের তো আর বেশী দিন থাক্‌বার যো নেই। কই, তুমি একদিন আমাদের বন-জঙ্গল-পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে এলে না ? আমরা চ'লে গেলে, দেখাবে না কি ? আর তুমি যে কোন্ সতীর বিষয়ে কি একটা কবিতা লিখেচো, ব'লছিলে ? সে দিন আমাদের অপ্‌সর ছিল না ব'লে তোমার কবিতা শুনতে পাল্লুম না। তা' আমাদের আর শোনানো হ'বে না, না কি ?"

যতীন বলিল—"বেশ কথা, আজই তোমরা বেড়াতে চল। আজই তোমাদের সব দেখিয়ে আন্‌বো, আর সেই পাহাড়ে ব'সে সেই কবিতাটীও শোনাবো।"

মেজবৌদিদি যোগমায়ার দিকে চাহিয়া বলিল "কি ভাই, আজই যাবে? বিকেল বেলাতেই যাওয়া যাক্, চল। ঠাকুর এখন বাড়ীতে নেই। আর সকাল বেলাতে কাজের ঝঞ্ঝাটে আমাদের তো ম'র্‌বারও অপ্‌সর থাকে না! চল, রাজু ঠাকুজ্জি ও বড়দিদিকে বলি গে।" এই বলিয়া মেজবৌদিদি, যোগমায়ার সহিত, নীচে গমন করিলেন।

আমি বলিলাম "কি বিষয়ে কবিতা লিখেচো, যতীন?"

"সিন্দুরে পাহাড় সম্বন্ধে।"

"সিন্দুরে পাহাড়? সিন্দুরে পাহাড় কোথায়?"

যতীন বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সিন্দুরেপাহাড় জানেন না? কি আশ্চর্য্য! এই যে আপনার বাড়ীর উত্তরে ছোট কাল পাহাড়টা, যার নীচে যমুনা নদী ব'য়ে যাচ্চে।"

"ওটার নাম সিন্দুরে পাহাড় না কি? কে জানে ভাই অত? আমি জানি একটা কাল পাহাড়। রোজই তো ওর উপরে বেড়িয়ে আসি; কিন্তু নাম টাম তো একদিনও শুনি নাই। তুমি নাম শুন্‌লে কোথায়?"

"কেন, এই পলাশবনেরই লোকের কাছে। ঐ পাহাড় সম্বন্ধে একটী সতীর অতি সুন্দর গল্প আছে। আমি সেই গল্প শুনে, ঐ পাহাড়ের উপরেই ব'সে, এক কবিতা লিখেচি। মেজবৌদিদি সেই কবিতারই কথা ব'ল্‌ছিলেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"দেখ্‌চি তুমি আমাদের ওয়ার্ড-স্বার্থ। ওয়ার্ড-স্বার্থও এই রকম বেড়াতে বেরিয়ে, মনেরমধ্যে কোনও ভাবের উদয় হ'লে, পকেট থেকে কাগজ পেন্‌শিল বা'র ক'রে, কবিতা লিখ্‌তে ব'স্‌তেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা এই রকম ক'রে ঘরের বাইরেই লেখা হ'য়েছিল।"

"হাঁ, তা জানি। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা ক'র্‌চেন! ওয়ার্ড-

স্বার্থে ছিলেন স্বর্গের কবি। জগতের মধ্যে একমাত্র তিনিই আদর্শ কবি-জীবন যাপন ক'রেছেন।"

"তিনি যে আদর্শ কবি-জীবন যাপন ক'রেছেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে জগতের মধ্যে তিনিই একক ন'ন।"

যতীন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল "আর কে ?"

আমি বলিলাম "আমাদের দেশে,এই ভারতবর্ষেই, এরূপ কবি ছিলেন।"

"আমাদের দেশে ছিলেন ? কে ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকি।"

"বাল্মীকি !"

যতীন্দ্রের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম "তুমি কি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পড় নাই ?"

যতীন্দ্র বলিল "ছেলে বেলায় তো একবার কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়েছিলাম। তা'তে তো লেখা আছে, বাল্মীকি রত্নাকর ডাকাত ছিলেন। পরে রাম নাম ক'রে তাঁর পাপক্ষয় হওয়াতে ব্রহ্মা এসে তাঁকে রামায়ণ লিখ্‌তে বলেন।"

আমি বলিলাম—"মহর্ষির রামায়ণে রত্নাকরের কোনই উল্লেখ নাই। তিনি রত্নাকর ছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহও আছে। আর যদিই ধর, তিনি প্রথম জীবনে কুকর্ম্মী রত্নাকর ছিলেন, তা' হ'লেও মনে রাখ্‌তে হ'বে, আমি রত্নাকরের কথা ব'ল্‌চি না। আমি মহর্ষি বাল্মীকিরই কথা ব'ল্‌চি।"

"আচ্ছা, বাল্মীকি কি প্রকার জীবন যাপন ক'রেছিলেন ?"

"বাল্মীকি মহর্ষির জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সত্য, সুন্দর, মহান্, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষের ধ্যানধারণায় জীবনের শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকালয়ের বহির্ভাগে, মহারণ্যের মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে, শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়া, কতিপয় অনুরূপ শিষ্যের সহবাসে, তিনি কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের লীলা হইয়াছিল, তাহা আমি মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম। সেই সৌন্দর্য্যের কণিকা মাত্র ধারণ করিতে গিয়া আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। জগৎপূজ্যা সীতাদেবী যাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, মহাত্মা রামচন্দ্র, ধীমান্ লক্ষ্মণ ও ভ্রাতৃভক্ত ভরত যাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে আজিও ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া সমানভাবে পূজ্য হইতেছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের কথা কি আর বলিতে হয়? রামায়ণ কিরূপে প্রথমতঃ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা তো তুমি জান?"

"না।"

"তবে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহর্ষি স্বভাবকবি ছিলেন। সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ পবিত্রতার একমাত্র আধার মহান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে, জগতে তাঁহার এই পূর্ণতার অভিনয় দেখিবার জন্য, মহর্ষির হৃদয়ে স্বভাবতঃ সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। জগতের সমস্ত মহাকবিরই হৃদয়ে সেরূপ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ অপূর্ণ; বোধ হয়, সেই পূ। মহাপুরুষের ইচ্ছাই এই প্রকার। কিন্তু অনেকে জগতে অপূর্ণতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় এবং সতর্ক না হইলে জগৎবিদ্বেষী ও মানববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। মহর্ষিরও জীবনে এক সময়ে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সংসারের মধ্যে কোথাও পূর্ণতা না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেন; সুতরাং বাল্মীকি ইঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভগবন্, আপনার তো কোনও স্থান অগম্য ও অবিদিত নাই; আপনি বলিতে পারেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন, যিনি পূর্ণ, আদর্শ-স্থানীয় ও সর্ব্বগুণোপেত?' নারদ বাল্মীকির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন—'মহর্ষে, আপনি যেরূপ পুরুষের কথা বলিলেন, জগতে তদ্রূপ পুরুষ অতি দুর্ল্লভ। কিন্তু বর্ত্তমান কালে, এইরূপ এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র। তিনি অযোধ্যার রাজা ও মহারাজ দশরথের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের জন্ম হইতে তাৎকালিক ঘটনা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র এই সময়ে লঙ্কা হইতে সীতা সমুদ্ধার পূর্ব্বক অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া প্রজাপালন করিতেছিলেন।

দেবর্ষি নারদের মুখে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাল্মীকির ক্ষুব্ধ হৃদয় আনন্দ ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক অলৌকিক দীপ্তি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এই সংসারক্ষেত্রে যেন স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবর্ষি নারদ স্থানান্তরে গমন করিলেন। বাল্মীকিও প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে, প্রিয়শিষ্য ভরদ্বাজের সমভিব্যাহারে, তমসার স্বচ্ছজলে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু বাল্মীকির হৃদয়ে তখনও বীণার অমৃতময় ঝঙ্কারের নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তিনি অলৌকিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছিলেন। তমসার স্বচ্ছ জল দেখিয়াই তিনি উল্লাসে ভরদ্বাজকে বলিলেন—'বৎস, দেখ দেখ, তমসার জলরাশি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় কিরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল।' স্বচ্ছজল দেখিয়াও তাঁহার হৃদয়

যেন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন—'বৎস, তুমি আমায় বল্কল দাও; আমি এই নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যে একবার পর্য্যটন করিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন———"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি, 'এমন সময়ে নীরো, চুনী, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি একদল বালক বালিকা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই বলিতে লাগিল "আমি যাব, আমি যাব।'

আমি বলিলাম—"কোথায় রে?"

নীরো বলিল—"কেন, এই যে মা, কাকীমা, রাজুপিসী, মঙ্গলাপিসী সবাই কাপড় প'রে তোমাদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্চে। আমাদেরও নিয়ে চল না, কাকাবাবু। মা আমাদের নিয়ে যেতে চাচ্চে না। তোমরা যদি না নিয়ে যাও, তবে আমরাও তোমাদের পেছু পেছু যাব।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, যাবি। গোল করিস্ নে, থাম্।"

এই কথা বলিতে বলিতে, ক্ষুদ্র মতিও উপরে উঠিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর আমার কোঁচা ধরিয়া ও মুখপানে চাহিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ব্যাকুলভাবে, তাহার স্বর্গীয় ভাষায় বলিতে লাগিল "কাকাবাবু আমিও দাব; আমিও দাব।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা যাবি; আমার কোলে ওঠ্।"

বাল্মীকির বৃত্তান্ত আর আমার শেষ করা হইল না। বৌদিদিরা, যোগমায়া, মঙ্গলা, রাজুদিদি, বৌদিদিদের দাসীদ্বয় সকলে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজ বৌদিদি আসিয়াই বলিলেন "কই, ঠাকুরপো, যতীন্দ্র,—তোমরা চল।"

আমি সকলের পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া বলিলাম "মেজ বৌদিদি, তোমরা কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্চ না কি? আমরাও দুই একটা মেঠাই সন্দেশ প্যাব তো?"

"তা পাবে বই কি? আমরা কি আর একলা খাব?"

আমি বলিলাম—"যতীন্দ্র ভায়া, ওঠ; আর দেখ্‌চো কি? অন্য কোনও সময়ে আবার বাল্মীকি সম্বন্ধে গল্প করা যাবে।"

এই বলিয়া আমরা সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। গৃহে কেবল জননী, মাসীমা ও কেশব রহিল। মেজ দাদা বাবার সঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আমরা আমাদের গৃহ-সংলগ্ন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মেজবৌদিদি বলিলেন "ঠাকুরপো, বনের মধ্যে ভাল পথ আছে তো?"

আমি বলিলাম "মানুষের তৈয়েরী পথ নাই। তবে গাছের মধ্যে এরূপ ফাঁক আছে, যা'র ভিতর দিয়ে অনায়াসেই যাওয়া আসা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ আছে, তোমরা কাপড় চোপড় একটু সাবধানে গুটিয়ে যাবে, যেন কাঁটাতে কাপড় না লাগে।"

যতীন পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইল। বালকবালিকারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পশ্চাতে চলিল। আমি চলিলাম সর্ব্ব পশ্চাতে। মতিলালই কেবল তাহার দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল।

মেজবৌদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুরপো, বনেতো কিছু ভয়ের কারণ নেই? তোমরা কি ক'রে বনের মধ্যে বেড়াও ভাই!

এ যে গাছ বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না! ঐ ঝোপগুলো এরই মধ্যে যে অন্ধকার হ'য়ে এসেচে! ওদের ভিতর তো কিছু লুকিয়ে থাকে না? ওমা, এযে দিনের বেলাতেই বনে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো।"

আমি বলিলাম "মেজবৌদিদি, ভয় কি তোমাদের? কিছু ভয় থাক্‌লে, আমরা কি তোমাদি'কে এদিকে নিয়ে আস্‌তুম? সুশীলারা তো রোজই এই দিক্ দিয়ে ফুল তুলতে যায়! কি সুশীলা, তোমার ভয় পাচ্চে?"

সুশীলা হাসিয়া বলিল "ভয় পাবে কেন? কিসের ভয়? আমিতো কতবার এক্‌লাই এই পথে ফুল তুলতে যাই।"

মেজবৌদিদি বলিলেন "তোমার না হয় যতীন রয়েচে, ভাই। তোমার দিদিরও জন্যে না হয় ঠাকুরপো র'য়েচে। তোমাদের তো কোন ভয় নেই; এ যে যত ভয় আমাদেরই হচ্চে। মঙ্গলা ঠাকুর্‌ঝি, ফিরে যাবি?"

মঙ্গলার মুখ শুকাইয়া আসিতেছিল। সে বলিল "ওগো, আমার মনে ছিল না গো। বগলাপিসী আমাকে বনের মধ্যে যেতে অনেকবার মানা ক'রেছিল গো।" তাহার পর ঈষৎ অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল "ও বৌদিদি, বনে বাঘ ভালুক নেই বা থাক্‌লো? বনে যে কত ঠাকুর দেবতা থাকে গো?"

মঙ্গলার এই কথা শ্রবণমাত্র স্ত্রীলোকেরা সহসা নিশ্চল হইল। যোগ-মায়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যতীন্দ্র বালকবালিকাগণকে লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সে মঙ্গলার এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই। রাজুদিদি ভয়সূচক স্বরে যতীনকে ডাকিয়া বলিল "ওরে যতীন, ফিরে আয়; আর বনে বেড়াতে যেতে হ'বে না।"

যতীন উচ্চৈঃস্বরে বলিল "তোমরা চ'লে এস না ; আমরা দিব্যি ফাঁকা জায়গায় এসেচি।"

কে যতীনের কথা শুনে! মঙ্গলা ও রাজুদিদি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মত করিল। মেজবৌ বড়বৌ ও তাঁহাদের দাসীদ্বয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মতিও তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া যেন ভয় পাইয়াছিল। সে বলিল "মা, তুই কোলে নে।" এই বলিয়া দাসীর ক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে গেল। যোগমায়ার অবশ্য কিছুই ভয় হয় নাই। সে রাজুদিদিকে মৃদুস্বরে বলিতেছিল "বনে কিছু ভয় নেই, ঠাকুর্ঝি, তোমরা এস।"

মঙ্গলাকে যত অনর্থপাতের মূল দেখিয়া আমি বলিলাম "মঙ্গলা, ঠাকুর দেবতার নাম ক'রে, তুই সকলকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্। আচ্ছা যা ; মনে ক'রে দেখ্, যদি কেউ কোথাও ঠাকুর দেখ্‌তে যায়, আর অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে, তা হ'লে তার কি হয়! বনের ঠাকুরদের বনই মন্দির ; এই মন্দির থেকে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্, আচ্ছা যা, এর পর মজাটি দেখ্‌তে পাবি।"

মঙ্গলা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল "ওমা, আমি কি যেতে মানা কচ্চি? বৌরা যে আপনারাই যেতে চাচ্চে না গো?"

আমি বলিলাম "বৌদিদি, তোমরা এস ; কিছু ভয় নেই।" এই বলিয়া সকলের অগ্রসর হইলাম।

গৃহে ফিরিয়া যাইলে কোনও অমঙ্গল হইতে পারে, এই মনে করিয়া স্ত্রীলোকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় আমার অনুবর্ত্তিনী হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা একটী পরিষ্কৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রায় দুই বিঘা পরিমিত স্থান একেবারে বৃক্ষশূন্য ; কিন্তু তাহার চারিদিকেই বন। বৈকালিক রৌদ্রপাতে সেই স্থানটি আলোকিত। বালক-

বালিকারা সেখানে দৌড়াদৌড়ি ও কোলাহল করিতেছে। কেহ নিকট-বর্ত্তী আরণ্য পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। যতীন্দ্র ভায়া একটী বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের উপরে বসিয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বনের ভিতর হইতে সহসা এই পরিষ্কৃত ও আলোকিত স্থলে উপনীত হইয়া যেন বিস্মিত, আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইল। কাহারও মুখ-মণ্ডলে একটুও ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। মেজবৌদিদি বলিয়া উঠিলেন "আহা, কি সুন্দর জায়গা, ঠাকুরপো! আমি মনে ক'রেছিলাম, বুঝি কেবলই গাছ! ওমা, বনের মধ্যে এমন জায়গা আছে ব'লে কে জানে? ওখানে ও কি? গরু চ'রে বেড়াচ্চে না কি, ঠাকুরপো? ঐ ছোট মেয়েটি একলাই এই বনের ভিতর গরু চরায় না কি? রাজু-ঠাকুজ্জি, ঠাকুরপো সত্যিই ব'লছিল, বনের মধ্যে কিচ্ছুরই ভয় নেই। আমরা ভাই সহুরে লোক; বন তো কখনও দেখিনি; তাই ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম "এই দেখ না, এই শালগাছের তলায়, এই ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে, রোজই আমি বই পড়ি। আজও সকালে এইখানে এসেছিলাম।"

বড়বৌদিদি বলিলেন "বেশ জায়গাটি ভাই। এইখানে আমরা একটু বসি।" এই বলিয়া তিনি ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেখা-দেখি অপর সকলেই বসিল। মেজবৌদিদি ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন "ও ঠাকুরপো, ওটা কি গো! ঐ লম্বা লম্বা কান! ঐযে গো, ঐ দেখ, ঐ বনের মধ্যে ঢুকে গেল!"

বৌদিদির কথা শুনিয়াই মঙ্গলা ভয়সূচক-স্বরে চীৎকার করিয়া সলম্ফে আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি রাগান্বিত হইয়া বলিলাম "করিস্ কি, পোড়ারমুখি, তোকেই আগে খেয়ে ফেল্বে না

কি ?” অপর সকলে মঙ্গলার ভাব দেখিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম “বৌদিদি, ওটা খরগোশ। নিরীহ জীব। কারুর অপকার করে না। বেচারী আগাছার কচি কচি পাতাগুলি খেয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন তোমাদের ভয়েই গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে গেল। মানুষ যে ওদের শত্রু! মারিয়া ওদের মাংস খায় ?”

বড়বৌ বলিলেন “ওমা, সেই যে কথামালাতে খরগোশ ও কুকুরের গল্প আছে, সেই খরগোশ !”

আমি বলিলাম “হাঁ”।

স্ত্রীলোকেরা আবার নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে উপবেশন করিল। যাহারা খরগোশটি দেখিতে পায় নাই, তাহারা খরগোশ দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল, যদি আবার বাহির হয়! বনের ভিতর হইতে সুকণ্ঠ পক্ষীদের শ্রুতিমধুর গান শুনা যাইতেছিল; সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি সকলকেই সাধ্যমত উত্তর দিলাম। সহসা দূর বনে একটা ময়ূর ডাকিয়া উঠিল। সকলেই ভীত ও চকিত মুখে আবার আমার দিকে চাহিল। আমি স্ত্রীলোকদের আকার প্রকার দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম “তোমাদের কিছু ভয় নাই; বনে ময়ূর ডাক্‌চে।”

যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোথাও ময়ূরের ডাক শুনিয়াছিল, তাহারা আমার কথার সমর্থন করিল।

যতীন বলিল “এখানে ব’সে থাক্‌লে তো চল্‌বে না; চল, আমরা পাহাড় দেখে আসি।”

যতীনের কথায় আবার সকলে উঠিলাম। স্ত্রীলোকদের বনভ্রমণের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া যতীনকে বলিলাম “ভায়া, যমুনা নদীর ধার দিয়ে যাওয়া যাক্। নদীর ধারে বন নাই, বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন; আর

রৌদ্রও আছে।” যতীন আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই দিকেই চলিল।

যমুনার ক্ষীণ স্রোত কোথাও একটী স্থূল রৌপ্য রেখার ন্যায় প্রলম্বিত ছিল; কোথাও কুল কুল শব্দে প্রস্তরময় উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিল; কোথাও বা বক্রগতি ধারণ করিয়া বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বালক বালিকারা তটিনী-গর্ভে সুগোল সুচিক্কণ বিচিত্র বর্ণের উপলখণ্ড সকল সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; এবং কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। নদীর বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত বিষয়ের গল্প করিতে করিতে আমরা পরিশেষে কৃষ্ণকায় সিন্দূরে পাহাড়ের পাদমূলে উপনীত হইলাম।

পাহাড়ের ভীম সৌন্দর্য্য দর্শনে স্ত্রীলোকদের মনে কিরূপ ভাব হইল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমি বলিলাম “মেজবৌদিদি, এই দেখ, সিন্দূরে পাহাড়। উপরে উঠ্‌বে চল।”

কথা শুনিয়াই সকলের বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। আমি বলিলাম “কিছু ভয় নাই। উঠ্‌তে কোনই কষ্ট হবে না। এই নদীর দিকে পাহাড়টা সমান ভাবে খাড়া হ’য়েচে বটে; কিন্তু এদিক্ দিয়ে আমরা উঠ্‌বো না। পূর্ব্বধারে চল।”

সকলকে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে লইয়া গেলাম এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সোপান-পরম্পরা-সংযোগে দ্বিতলগৃহে উঠিতে যেরূপ কোনই কষ্ট হয় না, সেইরূপ পাহাড়ের লম্বিত, আনত, রুগ্ন দেহ ভাঙ্গিয়া তাহার শিখরদেশে উপনীত হইতে কাহারই কিছু মাত্র কষ্ট বা শ্রমবোধ হইল না। পাহাড়ের গাত্র প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহা যেন একটী

বিস্তৃত, ঈষৎ আনত, কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে-ছিল। পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বিত ছিল।

স্ত্রীলোকেরা ও বালকবালিকারা যথেচ্ছ উপবেশন করিয়া পাহাড়ের উপর হইতে সবিস্ময়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতেছিল। পাহাড়ের পশ্চিমভাগে তাহার পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া যমুনাতটিনী বিসর্পিত গতিতে অনন্ত অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল। নদীটি উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতে-ছিল। বৈকালিক সূর্য্যের রশ্মিমালা বনের সুচিক্কণ হরিৎ-পত্ররাজির উপর বিকীর্ণ হইয়া মনোহর শোভার সৃষ্টি করিতেছিল। পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পলাশবৃক্ষের অন্তরালে কৃষ্ণ-প্রস্তর-স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিন্যস্ত হইয়া সেই স্থানের ভীষণতা দ্বিগুণতর বৃদ্ধিত করিতেছিল। স্ত্রীলোকদের মুখাবলোকন করিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহারা এই ভীমসৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কিছুমাত্র সমর্থ হইতেছিল না। পাহাড়ের অব্যবহিত দক্ষিণ দিক্‌টি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। বন এক প্রকার নাই বলিলেও চলিতে পারে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে নীরো বলিয়া উঠিল "মা, ঐ দেখ, বনের মধ্যে কাদের বাড়ী।" সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মেজবৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সত্যি তো! ও কাদের বাড়ী, ঠাকুরপো?" আমি হাসিয়া বলিলাম "কাদের বাড়ী, তোমরা দেখ নাই না কি? সুশীলা একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল "ও হো, এ যে তোমাদের বাড়ী গো। ঐ যে আমাদের গ্রাম!" স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হইল। মেজবৌদিদি বলিলেন "ঠাকুর পো, এত নিকটে আমাদের বাড়ী? কই এদিকে তো বেশী বন নেই? তবে তো আমাদি'কে আর বনের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে হ'বে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "না।"

মেজবৌদিদি অমনি বলিয়া উঠিলেন "আঃ, বাঁচ্লুম, ভাই। তোমাদের বন বেড়ানোকে দণ্ডবৎ করি। আমি তো দিশে হারা হ'য়ে গেছ্লুম। কোন্ দিক্ দিয়ে এলুম, কোন্ দিক্ দিয়ে বেরুলুম, আর কোন্ দিক্ দিয়ে যে যাব, তা তো আমি কিছুই ঠিক্ ক'র্তে পারি নি; বাড়ীর দিকেই এতক্ষণ আমার মনটা প'ড়েছিল। বাড়ীটে দেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লো।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "মেজবৌদিদি, বন জঙ্গল তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের জন্য ঘর সংসারই উপযুক্ত স্থান। বনের মধ্যে তোমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেবল সীতাদেবীই তাঁর স্বামীর সঙ্গে গভীর অরণ্যের মধ্যেও নির্ভীকচিত্তে বেড়াতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তিনি কিরূপ নারী ছিলেন, যোগমায়ার কাছে শুন্বে।"

মেজবৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা ভাই, তাই হ'বে; ভট্‌চায্যি ম'শাইকে এখন জিজ্ঞেস করে জান্বো।—যতীন, তুমি কি এই পাহাড়ের সম্বন্ধেই কবিতা লিখেচো? কই, আমাদের তা শোনাও দেখি?"

যতীন বলিল "আগে এইখানে এসে একটি ফাট্ দেখে যাও।"

আমরা সকলেই গিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উত্তরাংশটী আমূল ফাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ফাটটি এরূপ প্রশস্ত যে, তাহা লাফাইয়া পার হইতে শঙ্কা হয়। তাহার নিম্নদেশ অন্ধকারময় ও লতাকীর্ণ। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে কোনও ভীষণ বন্যজন্তুর নিভৃত আবাস-স্থান মনে করিয়া শঙ্কিত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যতীন সকলকে বসিতে বলিয়া নিজেও একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল ঃ—"বহুকাল পূর্ব্বে এই পলাশবন গ্রামে একটী সতী স্ত্রীর বাস ছিল। সেই সময়ে এই পাহাড়ের কন্দরে একটী বড় অজগর সাপও বাস করিত। (কথা শুনিয়াই স্ত্রীলোকেরা সকলে শিহরিয়া উঠিল)। সেই সাপটা একদিন সেই সতীর স্বামীকে পাহাড়ের ধারে পাইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। (স্ত্রীলোকদের ভয়সূচক অস্ফুট চীৎকার)। সতী ঘরে বসিয়া সিন্দুরের কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া মাথায় সিন্দুর পরিতেছিল, এমন সময়ে সে তাহার স্বামীর বিপদের কথা শুনিল। শুনিয়াই সে কৌটা-হাতেই পাহাড়ের ধারে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার স্বামীকে ও সাপকে বাহির করিয়া দিবার জন্য পাহাড়ের অনেক স্তবস্তুতি করিল। কিন্তু পাহাড় সতীর কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন সতী রাগে আগুন হইয়

পাহাড়ের গায়ে হাতের সেই কৌটার বাণ মারিল। পাহাড়ের গায়ে যেমন কৌটা লাগিল, অমনি পাহাড় ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সাপ মরিল এবং সাপের পেট হইতে সতীর স্বামী জীবন্ত দেহে বাহির হইয়া আসিল। সতী পাহাড়কে সিন্দুরের কৌটা মারিয়াছিল বলিয়া পাহাড়ের নাম হইল, "সিন্দুরে পাহাড়।"

গল্প শুনিতে শুনিতে স্ত্রীলোকেরা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যোগমায়া তাহার আয়ত চক্ষুদুটি যতীনের দিকে স্থির করিয়া সবিস্ময়ে একমনে এই গল্প শুনিতেছিল। বালকবালিকারাও নিশ্চল হইয়া গল্প শুনিতেছিল এবং যতীনের বাক্য শেষ না হইতে হইতে, ভয়াকুলিতচিত্তে, স্ত্রীলোকদের মাঝখানে আসিয়া বসিল। মেজবৌদিদি ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"যতীন, আমরা তো তবে পাহাড়ের উপরে উঠে ভাল কাজ করি নি।"

যতীন বলিল—"উঠেচো তো কি হ'বে। এখানকার মেয়েদি'কেও তো আমি পাহাড়ের ধারে আস্‌তে দেখেচি। একদিন এই পাহাড়ে এসে সতীর পুজো দিয়ে যেও, তা হ'লেই হ'বে।"

"তাই ক'র্‌বো" এই কথা বলিয়া মেজবৌদিদি পাহাড় ও সতীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ আনত করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন। অপর স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। মতি কিছু করিল না দেখিয়া দাসী তাহার ঘাড় নোয়াইয়া দিল।

যতীন বলিল "এখন সকলে স্থির হইয়া কবিতা শোন। শুনিলে নিশ্চিত আনন্দিত হইবে।" এই মুখবন্ধের পর সে কবিতা-পাঠ আরম্ভ করিল ঃ—

"সিন্দূরে পাহাড়।

"নগ্নদেহ, কৃষ্ণকায়, সিন্দুরে পাহাড়,
এক ভাবে, এক ধ্যানে,
কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দূরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
হেরিয়া তোমার পাশে,
নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি করে তোমার পূজন—
সিন্দূরে পাহাড়, তুমি ভীমদরশন।

যতীন এই পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এমন সময়ে মেজবৌদিদি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই দেখ, যতীন, তুমি তো নিজেই লিখেচো, পাহাড়ের পাশে কেউ আসে না! আমাদের তবে এখানে আন্‌লে কেন? কোন তো অপরাধ হ'বে না?"

যতীন বিরক্ত হইয়া বলিল "কি আপদ! তুমি ভয় পাচ্চ কেন? কবিতাতে ওরূপ না লিখ্‌লে কি চলে? তোমরা মন দিয়ে শুনে যাও; আমাকে পড়ার সময় বাধা দিও না।" এই বলিয়া আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিল:—

নগ্নদেহ, কৃষ্ণকায়, সিন্দূরে পাহাড়,
　　এক ভাবে, এক ধ্যানে,
　　কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দূরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
　　হেরিয়া তোমার পাশে,
　　নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি করে তোমার পূজন—
সিন্দূরে পাহাড়, তুমি ভীম দরশন।

"অজর অমর তুমি, অতি পুরাতন—
　　জানি না যে কোন্ কালে,
　　উঠিয়াছ মাথা তুলে,
ভেদিয়া ধরণী দৃঢ় বজ্রের মতন,
কে করে তোমার শৈল, কাল নিরূপণ ?

"না জানি কতই যুগ তুমি শৈলেশ্বর,
　　আপন জনম হ'তে,
　　হেরিয়াছ এ ভারতে ;—
সত্য ত্রেতা হেরি, তুমি হেরে'ছ দ্বাপর ;
অনন্ত কালের সাক্ষী, তুমি গিরিবর।

"নীরব তোমার ভাষা, প্রাণ-উন্মাদিনী।
বসি' তব পদতলে,
শুনি শৈল, কুতূহলে,
কত-না পুরাণ কথা, অপূর্ব্ব কাহিনী।
কতবার অশ্রুজলে ভিজাই ধরণী!

"সতীর মহিমা তুমি করিছ প্রচার,
নীরব গম্ভীর স্বরে,
এ জগৎ চরাচরে,
অবলা নারীর কাছে অচলের হার,—
তুমি হে জীবন্ত সাক্ষী সতী-মহিমার।

"সতীর পবিত্র ধনে ভীম অজগর
গরাসিল যবে হায়,
ঠাঁই দিলে তুমি তায়
তোমার কন্দরে, নাহি ভাবি পূর্ব্বাপর—
ভাবিলে না সতীতেজ কিরূপ প্রখর।

"পতির দুর্দ্দশা শুনি সতী অচঞ্চল
অশনি-তাড়িতা প্রায়!
সহসা সে বেগে ধায়
মুহূর্ত্তে সম্বিৎ লভি, বাঁধিয়া আঁচল।
ছুটিলা যথায়, তুমি আছহে অচল।

"পতিসোহাগিনী বালা মনের হরষে,
স্থবেশ রচনা করি,
ভালেতে সিন্দুর পরি,
সিন্দুরের-কৌটা-হাতে গৃহে ছিলা ব'সে,
আহা, প্রিয়-প্রাণপতি-আগমন-আশে।

"হাতে কৌটা ছিল যথা, ছুটিলা তেমনি;
উত্তরিলা তব পাশে,
প্রাণপণে, উর্দ্ধশ্বাসে,
আলু থালু বেশ কেশ, যেন পাগলিনী—
পতিহীনা অভাগিনী, মণিহারা ফণী!

"পতি তরে মুগ্ধা বালা চারিদিকে চায়;
পতিধনে নাহি হেরি,
পতিনাশ শঙ্কা করি,
মুক্তকণ্ঠে কাঁদে, আহা, কুররীর প্রায়—
পতিশোকে সতী নারী ধরণী লুটায়।

"স্থাবর জঙ্গম স্তব্ধ সতীর রোদনে!
যমুনার স্বচ্ছ জল,
সতী শোকে অচঞ্চল;
প্রকৃতি বিষাদময়ী সতীর কারণে;
হাহাকার ধ্বনি শুধু পশিল শ্রবণে।

"উন্মাদিনী সতী নারী তোমায় অচল,
 কতই বিনয় ক'রে
 সেই কাল অজগরে
নিঃসারিতে বলিলা হে, হইয়া বিকল,
পাষাণ হৃদয় তবু হ'লো না তরল।

"তবে সতী রোষে অতি আপনা হারায় ;
 নয়নে অনল ছুটে,
 কটীতে বসন আঁটে,
কৌটাসহ বাহু তুলে মহাবেগে ধায়,
দেখি সে মুরতি সবে তরাসে পলায়।

"বলে সতী উচ্চৈঃস্বরে, 'শুনহে তপন,
 তুমি সকলের গতি,
 যদি আমি হই সতী,
কায়মনোবাক্যে যদি পতির পূজন
 কখনও ক'রে থাকি,
 তা হ'লে রহিবে সাক্ষী,
কৌটার আঘাতে গিরি করিব ছেদন,
উদ্ধারিব আজি আমি প্রিয় পতিধন।'

"জ্যোতির্ম্ময়ী বালা সেই এতেক বলিয়া,
 তবোপরি কৌটা হানে ;
 কড় কড় মহাস্বনে,
ফাটিল, কঠোর গিরি, দুখান হইয়া—
মহানাদে জীব জন্তু উঠে চমকিয়া।

"অজগর বুক ফেটে ত্যজিল পরাণ;
অক্ষত শরীরে পতি
বাহিরিলা শীঘ্র গতি;—
স্বরগে দুন্দুভিধ্বনি, সতী-যশোগান—
চারিদিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস মহান্।

"ছুটিল যমুনা জল কুলু-কুলু-তানে,
সতীত্ব-মহিমা-কথা,
মর্ম্মরিল বৃক্ষ লতা;
প্রকৃতি হাসিলা পুনঃ সতীর সম্মানে;
দশ দিক্ পূর্ণ হ'লো আনন্দের গানে।

"এদিকে লভিয়া বালা প্রিয় পতি-ধনে,
তোমার চরণ-মূলে,
নাথসহ, কুতূহলে,
প্রণতি করিলা, মরি, সলজ্জ নয়নে;
তুষিলা তোমায়, গিরি, মধুর বচনে।

"আশীর্ব্বাদ করি তারে বলিলে তখন :—
'প্রসন্ন তোমার প্রতি,
হ'য়েছি গো আমি, সতি,
তোমার সতীত্ব-যশ ঘোষিবে ভুবন।
যাবৎ এ চরাচর,
তারা, শশী, দিবাকর,
তাবৎ মহিমা তব করিব কীর্ত্তন,
সতীত্ব-প্রতাপ-চিহ্ন করিব ধারণ।'

" 'সিন্দুরে পাহাড়' তেঁই তব অভিধান।
সতীত্বের কীর্ত্তি ব'লে,
যমুনা তরঙ্গ তুলে,
তব পদ ধৌত ক'রে আনন্দে অজ্ঞান—
কল-কল-নাদে ধায় পতি-সন্নিধান।*

"এখনো কৃষাণ-বালা চারু মধু মাসে,
করজোড়ে তব আগে,
পতিব্রতা-বর মাগে,
পতি-সোহাগিনী হ'তে তব কাছে আসে ;
এখনো পূজযে তোমা পতি-সুখ-আশে।"

"বালবধূ পতি-গৃহ-গমনের কালে,
তোমার চরণ-তলে,
করে নতি কুতূহলে ;
ভিজায় চরণ তব তপ্ত অশ্রুজলে,
তোমার পবিত্র দেশ ছাড়িবার কালে।

"এখনো প্রাবৃট্ কালে, মেঘাবৃত দিনে,
যবে বরিষার ধারা,
বুক পাতি লয় ধরা,
ঠাকুমার কাছে বসি যত শিশুগণে,
শুনে সতী-কীর্ত্তি-কথা অবহিত মনে।

* দ্বারকেশ্বর নদ, যাহার সহিত যমুনা মিলিত হইয়াছে।

"অদূরে কৃষক-গ্রামে যদি কোন নারী,
যৌবনের মত্ততায়,
পথিভ্রষ্ট হ'তে চায়
তোমার ভ্রূকুটী হেরে ভয় হয় ভারি,
সিন্দুরে পাহাড়, তাহা মহিমা তোমারি!"

কবিতা-পাঠ শেষ হইলে, স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে একটী বিস্ময় ও আনন্দের অস্পষ্টধ্বনি সমুত্থিত হইল। আমিও যতীন ভায়ার কবিতাটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যতীন তাহার কবিতার প্রশংসা শুনিয়া যেন ঈষৎ হৃষ্ট হইল এবং বলিতে লাগিল "কিন্তু এই পাহাড়ের উপরে ব'সে কবিতাটি পাঠ না ক'র্‌লে,ইহার তত সৌন্দর্য্য থাকে না।"

আমি বলিলাম—"তুমি যথার্থ ব'লেচো।"

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার প্রায় উদ্যোগ করিতেছিলেন। পাহাড়ের কাল ছায়া ধীরে ধীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী অস্পষ্ট কলরব উত্থিত হইতেছিল। রাখাল বালকেরা গো-মহিষাদি লইয়া একে একে বনের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল এবং কখন কখন সুমধুর কণ্ঠে দুই একটী গান গাহিয়া সুস্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতেছিল। বিহঙ্গম-কুলের কোলাহলে বনস্থলী শব্দায়মান হইতেছিল এবং বৃক্ষপত্র মর্ম্মরিত করিয়া সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। সায়ংকালের এই রমণীয় দৃশ্যটি স্ত্রীলোকদের মনেও একটী অস্পষ্ট অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিয়া থাকিবে; যেহেতু অনেকক্ষণ কেহ একটীও কথা কহিল না এবং বালকবালিকারাও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেজবৌদিদি যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, এ যে সন্ধ্যে হ'য়ে এল; চল, বাড়ী যাই। মা আবার ভাব্‌বেন।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম এবং সকলের সহিত ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু নামিয়াই পাহাড়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিল।

বাড়ী আসিতে আমাদের অধিক সময় লাগিল না। আমাদের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া জননী কেশবকে আমাদের অনুসন্ধানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। বৌদিদিরা ও বালক বালিকারা, জননী ও মাসীমার সহিত, বন-ভ্রমণের গল্প করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলা ও ভূদেব তাহাদের দিদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল। আমরা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলাম।

পর দিন প্রভাতে জননী ও মাসীমা বলিলেন—"দেবু, যতীন, আমরাও এক দিন সতীর পাহাড় দেখে আস্‌বো।"

যতীন বলিল—"সেই দিন অমনি পূজো দিয়েও এসো।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মেজদাদার অবকাশকাল শেষপ্রায় হইয়াছিল। তিনি কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন, কিন্তু জননী দেবীর অনুরোধক্রমে মেজবৌদিদিকে ও ছেলেদিগকে কিছুদিনের জন্য পলাশবনে রাখিয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস পরে মাসীমা ও রাজুদিদিও স্বদেশে গমন করিলেন। তাহার পর বড় বৌদিদিকেও পাঠাইয়া দিবার জন্য বড়দাদা চিঠি লিখিলেন। সুতরাং, পিতৃদেব একটী শুভদিন দেখিয়া তাঁহাকে ও নীরোকে লইয়া বড়দাদার কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। বাড়ীখানা প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। যে স্থলে নিত্য আনন্দোৎসব হইত, তাহা যেন বাসেরও অযোগ্য হইয়া উঠিল। মেজবৌদিদি একদিন আমাকে বলিলেন "ঠাকুরপো, আমায় তো, ভাই, বাড়ীখানা যেন গিল্‌তে আসচে। বড়দিদি, মাসীমা, রাজুঠাকুর্ঝি, সবাই যে চ'লে গেল!"

মঙ্গলা সেখানে উপস্থিত ছিল; সে বলিয়া উঠিল "আর মেজদাদাঠাকুরও গেছেন!"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন "সে কথা তো মিথ্যে নয়।—মঙ্গলা ঠাকুর্জ্জি, তোকে ব'লতে কি ভাই, সত্যি আমার এখানে আর একদণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে ক'রচে না। কিন্তু ঠাকুরপোর আমাদের কোনই কষ্ট নাই; বরং আমরা থাকাতেই ওঁর বেশী কষ্ট হ'চ্চে। ঠাকুরপো একলা থাকতে ভাল বাসে; বনের মধ্যে একলা ব'সে থাকে; একলা বেড়ায়, একলা পড়ে। আমরা সব এখানে থেকে ঠাকুরপোকে জ্বালাতন ক'রচি বই তো নয়! কি বল, ঠাকুরপো?

আমি মেজবৌদিদির কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "বৌদিদি, মেজ দাদার কাছে তুমি যেতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তোমরা সব ছিলে বা আছ ব'লে যে আমি জ্বালাতন হই বা হ'য়েচি, একথা আমায় ব'লো না। একথা শুনলে আমার কষ্ট হয়। আত্মীয় স্বজনেরা নিকটে থাকলে কেউ কি অসুখী হয়? যে হয়, সে নরাধম। তবে একথা সত্য বটে, আমি কিছু নির্জ্জনতাপ্রিয়। আমি গোলমাল কিছু কম ভালবাসি। একলা একলা ভ্রমণ ক'রতে, একলা একলা থাকতে আমার কিছু আনন্দ হয়।"

মেজবৌদিদি বলিলেন "আমিও তো তাই ব'ল্‌চি। আমি তো আর অন্য কথা বলি নি। এখন আমায় বল দেখি, দেশশুদ্ধ লোক দশজনের সঙ্গে থাকতে পেলেই আনন্দিত হয়; তুমিই কেবল একলা একলা থাকতে আনন্দ পাও কেন?"

আমি মেজবৌদিদির প্রশ্নের ভঙ্গীতে তাঁহার অভিযোগের কারণ বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া বলিলাম "আমি একলা থাকতে কেন ভাল বাসি, তা তোমায় কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? নির্জ্জনে একলা ব'সে চিন্তা ক'রতে আনন্দ হয়, নির্জ্জনে একলা ব'সে বই প'ড়্‌তে আনন্দ হয়, তাই নির্জ্জনে একলা থাকতে ভালবাসি। আবার অন্য সময়ে যতীন

ভায়ার সঙ্গে বই পড়ি, গল্প করি, কথাবার্ত্তা কই, বেড়াই। কই, সব সময়ে তো আর একলা থাকি না?"

"সে কথা সত্যি বটে; কেবল আমার বোন্‌টির কাছে দুদণ্ড ব'সতে গেলেই তোমার যত কষ্ট হয়!"

আসল কথা বাহির হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম "বৌদিদি, তোমার বুঝ্‌বার ভুল। আমি এত নির্ব্বোধ নই। স্ত্রীর কাছে ব'সে থাকতে কারুর কি কষ্ট হয়? তবে একটী নির্ব্বাক্ কাঠপুত্তলের কাছে বসে থাকা বড় কষ্টজনক বটে। কাঠ-পুতুলের কাছে ব'সে থাকার চেয়ে বই পড়া আমি ভাল মনে করি, দুজন চাসাভুসো লোকের সঙ্গে আলাপ করা উপকারজনক মনে করি, কিম্বা প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে নীরবে ব'সে থাকাও খুব আনন্দজনক মনে করি।"

আমার কথা শুনিয়া মেজবৌদিদি কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তোমার যাতে আনন্দ হয়, তাই তুমি করগে যাও, ভাই; তা'তে আমাদের কিছু এসে যাবে না। কিন্তু খপরদার, তুমি আমার বোন্‌কে কাঠ-পুতুল ব'ল্‌তে পাবে না। যোগমায়া যদি কাঠ-পুতুল হয়, তবে কাঠ-পুতুল নয় কে, তাই আমি জান্‌তে চাই। লেখাপড়া শিখে খুব রসিকতা শিখেচো যা হো'ক্! তোমাদের ইংরেজী শাস্ত্রের এই রসিকতা না কি?"

আমি দেখিলাম, মেজবৌদিদি আজ সত্যসত্যই যেন একটু চটিতেছেন। সুতরাং আমি ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া বলিলাম "মেজবৌদিদি, রাগ ক'রো না। তুমি যা ব'ল্‌চো, তা আমি মানি। যোগমায়া যে কাঠ-পুতুল নয়, তা আমারও বিশ্বাস। কিন্তু সে বিশ্বাস শেষপর্য্যন্ত যথার্থ হবে কি না, তা এখন আমি বুঝ্‌তে পারচি না।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? পরের মুখে কিছু ঝাল খাওয়া যায় না। তোমরা ব'ল্‌চো, যোগমায়া বড় সুশীলা ও গুণবতী। বেশ কথা। যোগমায়া যে সুশীলা, তা আমি বিয়ের পূর্ব্বের থেকেই জানি। কিন্তু তার যে অসাধারণ কোনও গুণ আছে, তা আমি জানি না। জান্‌বার চেষ্টা ক'রেও জান্‌তে পারি নাই। কথা না কইলে লোকের মনের ভাব বুঝ্‌বো কি ক'রে? যোগমায়ার সঙ্গে আজ এতদিন বিয়ে হ'য়েচে; কই একটী দিনও তো সে মন খুলে কথা কইলে না? এ কি ধারার লজ্জা বল দেখি? এ লজ্জা, না আব কিছু, তাই বা কে জানে?"

মেজবৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আব কিছু, কি?"

আমি বলিলাম "হয়ত, ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য।"

মেজবৌদিদি আমার কথা শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার হাস্যেব কারণ বুঝিতে না পারিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলাম। তিনি বলিলেন "ঠাকুরপো, ঐ এক কথাই যেথানে সেথানে? আমি দেখ্‌চি, তোমবা সব ভাইয়েই সমান। আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর, বিয়ের ক'নে একটা পঁচিশ বছরের মাগীর মতন তোমাদের সঙ্গে কথা ক'বে? না, মেমসাহেবের মতন তোমাদের হাত ধ'রে বেড়িয়ে বেড়াবে? যদি মেমসাহেব ক'র্‌তে চাও, তাও হ'বে, দুটিদিন সবুর কর। হিন্দুর ঘরের মেয়ে; ছেলেমানুষ; তোমাদের মতন মিন্সেদের সঙ্গে তাদের দুদিনেই গলাগলি ভাব হ'বে কি ক'রে গো?" এই বলিয়া তিনি আবার হাসিতে লাগিলেন।

আমি মেজবৌদিদির বিদ্রূপের যাথার্থ্য ও তীব্রতা অনুভব করিয়া তাঁহার কথার কোনই উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন "ঠাকুরপো, যোগমায়া তোমার সঙ্গে মনখুলে

কথা কয় না ব'লেই তোমার অভিমান হ'য়েচে, তা আমি বুঝেচি। কিন্তু আমি তোমাকে একটী কথা ব'লে দিচ্চি, সেইটী মনে রাখ্‌বে। 'সবুর কর।' কথাতেই তো ব'লে, সবুরে মেওয়া ফলে। সময় হ'লেই মুখ ফুট্‌বে। অসময়ে ফুল ফুটে না, মুখ ফুটে কি? সব মেয়েরই ঐরকম ধারা। তুমি ছোট ভেয়ের মতন; তোমাকে ব'ল্‌তে লজ্জা কি?— আমরাও একদিন ঐ রকম ক'রেচি। কিন্তু তা ব'লে মনে ক'রো না, মেয়েরা কিছু জানে না, বা তাদের মনে কিছু হয় না। প্রথম প্রথম সকলেরই বড় লজ্জা হয়; তাই কথাগুলো মুখে বাধ বাধ করে। অনেক মেয়ে বুক ফেটে মরে, তবু মুখ ফুটে কথা কয় না। তার উপর আবার তোমাদের বাক্যবাণ ও অভিমান আছে! মেয়েরা কথায় ভালবাসা জানায় না বটে; কিন্তু আবশ্যক হ'লে, বিয়ের ক'নেটি পর্য্যন্ত তার স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে। তোমরা যতই কেন বড়াই কর না, যতই কেন মুখে ভালবাসা দেখাও না, মেয়েদের সমান কখনই হ'তে পারবে না!"

এই শেষোক্ত কথাগুলি মেজবৌদিদি একটু দম্ভের সহিত বলিলেন। আমি তাঁহার কথায় অনুমোদন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম "তা অনেকটা যথার্থ বটে।"

মেজবৌদিদি আবার বলিতে লাগিলেন "যোগমায়া তোমার সঙ্গে কথা ক'বে কি, তুমি তো সমস্ত দিনই বই নিয়ে ব্যস্ত থাক। সকাল বেলায় তুমি বনে বেড়াতে যাও; আর সকালে, ভাই, আমাদেরও কাজ-কর্ম্মের বড় ঝঞ্ঝাট থাকে। ভাত খেয়েই আবার তুমি কোথায় বেরিয়ে যাও। সেই সময়ে আমাদের একটু অবসর থাকে বটে, কিন্তু তুমি ঘরে না থাক্‌লে, যোগমায়া কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে কথা ক'বে? রাত্রিতে—ছেলে মানুষ—কোন দিন ঘুমিয়ে পড়ে, কিম্বা মনে করে,

কেউ বুঝি আড়ি পেতে তার কথা শুনচে। দিনের বেলায়, তুমি বই নিয়ে বনের মধ্যে প'ড়্‌তে গেলে, যোগমায়া এক শ বার কত ছল ক'রে, তোমার প'ড়্‌বার ঘরে এসে, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি কি তার অন্তরের খবর পাও ?"

আমি বলিলাম "খবর পাই না বলেই তো যত দুঃখ। যদি একটু খবর পেতাম, তা হ'লে যে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেতাম! যোগমায়ার অন্তরের পরিচয় পাবার জন্যে কত চেষ্টা ক'রেচি, তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা ক'রেচি ; কিন্তু সব কথারই সেই এক উত্তর—'আমি জানি না।' আচ্ছা, বাবা, জানি না তো জানি না। আমারও কিছু জান্‌বার দরকার নাই। আমি যেমন ছিলাম, তেমনই থা'ক্‌বো। উদাসীন ছিলাম, আবার উদাসীন হ'ব। বনে জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়াবো। একলা থাক্‌বো, একলা প'ড়্‌বো, একলা ব'সে চিন্তা ক'র্‌বো। বই আছে, সাধুমহাত্মা-দের জীবনচরিত আছে, ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। এই সকলের আলোচনা ক'র্‌বো। এই সকলের আলোচনাতে যে আনন্দ পাব, শত যোগমায়া-তেও নিশ্চিত সে আনন্দ পাব না। তার পর প্রকৃতিদেবী আছেন, ভগবান্ আছেন,—প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে বসিয়া ভগবানের অপার মহি-মার কথা চিন্তা ক'র্‌তে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দ কি জগতের আর কোনও বস্তুতে কখনও পাবার আশা করি ? এ ছাড়া পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই বৃহৎ জগৎ র'য়েচে—এই জগতে কি অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রই দেখ্‌তে পাচ্চি! যোগমায়ার মায়াতে বদ্ধ হ'য়ে আমি জীবনের কর্ত্তব্য ভুল্‌তে চাই না। আমি চাই এই অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে,—এই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে। বিয়ে ক'র্‌লে, পাছে আমি জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন কর্‌ত্তে না পারি, এই জন্যেই আমি এতকাল বিয়ে ক'র্‌তে সম্মত হই নাই। স্ত্রী যদি আমার মনোমত হ'তো, আমার জীবনের উদ্দেশ্য

বুঝ্‌তে পেরে, আমার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত হ'তো, তা হ'লে খুব সুখেরই বিষয় হ'তো। আচ্ছা, সে সুখ যদি হ'বার নয়, তবে নাই হো'ক্। আমি তজ্জন্য দুঃখিত নই। যোগমায়া যদি আমার সঙ্গে জীবন-পথে অগ্রসর হ'তে না চায়, তবে সে যেখানে আছে, সেইখানেই প'ড়ে থাক্। আমি কিন্তু তা'র জন্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বো না, স্বপদে কুঠারাঘাত ক'র্‌বো না, স্বহস্তে এই হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ক'র্‌বো না। আমি এই মায়ার বাঁধন ভেঙ্গে, অদম্য তেজে, অসীম উৎসাহে, এই অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে বেরিয়ে প'ড়্‌বো।"

মেজবৌদিদি আমার এই আগ্রহপূর্ণ কথা গুলি শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন "ঠাকুরপো, তোমাকে আমরা ছেলে বেলা থেকে জানি; তোমার যে মন উচ্চ, তোমার যে মনের এই রকম ভাব, তা আমরা মেয়ে মানুষ হ'লেও কিছু কিছু বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু তুমি একেবারে এমনতর হতাশ হ'য়ে প'ড়ো না। যোগমায়াকে তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নি। যোগমায়ারও মন খুব উচ্চ। যোগমায়ার মতন এমন সরল উদার প্রকৃতির মেয়ে আমি আর দুটি দেখ্‌তে পাই নি। তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না। আবার ব'ল্‌চি, দুটিদিন সবুর কর। তা-হ'লেই, তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পা'র্‌বে।"

আমি বলিলাম "মেজবৌদিদি, তুমি সবুর ক'র্‌তে ব'ল্‌চো, আচ্ছা আমি সবুর ক'র্‌তে রাজি আছি। কিন্তু একটী বিষয় জান্‌বার জন্যে আমার মন ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে থাকে। যোগমায়ার সঙ্গে আমার চিরকালের সম্বন্ধ হ'য়ে গেছে। যার সঙ্গে চিরটিকাল কাট্‌তে হ'বে, সে কেমন লোক, তা জান্‌বার জন্যে ইচ্ছে হয় না কি? আর যোগমায়া কিছু কচি মেয়েটি নয়; ওর বয়সী আরও তো ঢের মেয়ে আছে; কই, তারা তো কখনও ওর মত ব্যবহার করে না? আমি তোমাদি'কে আমার

বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের কথা কতবার ব'লেচি। সুরমার কথাও তোমরা অনেকবার শুনেচো। সুরমা যে রকমের মেয়ে, তা'র হৃদয়টি যেরূপ সরল, তা'র মনের ভাব যেরূপ পবিত্র, আমি তো সেরূপ আর কোথাও দেখ্‌তে পাই না। তা'র কথা মনে হ'লে, তা'কে যেন দেবকন্যা ব'লেই আমার ভ্রম হয়। এই দেখ না, এখনও তা'র বিয়ে হয় নাই, কিন্তু সে তো সত্যকে পত্র লিখ্‌তে কোন লজ্জা করে না? সত্য এলাহাবাদ থেকে আমায় লিখেচে, সুরমা পত্র লিখে তার পীড়ার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ ও চিন্তা প্রকাশ ক'রেচে। অথচ সুরমা একথাও জানে যে, সত্যেরই সঙ্গে তার বিয়ে হ'বে। আচ্ছা সুরমা এরকম কেন, বল দেখি?

মেজবৌদিদি একটু হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, তার মানে আছে। সুরমা ছেলেবেলা থেকে সত্যকে দেখ্‌চে, আর ছেলেবেলা থেকে তাদের ভাইবোনের মত ভাব। কিন্তু সকলে তো আর ভাই-বোন্ নয়। (মেজবৌদিদির বিদ্রূপ কি তীব্র!) সুরমা এখন নাই ধর, বিয়ের কথা জেনেচে; কিন্তু ছেলেবেলাকার সে ভাবটি তো আর যায় নি? বরং সে ভাবটি এখন আরও গাঢ় হ'য়েচে। যোগমায়ার সঙ্গে তোমার ওরূপ সম্বন্ধ থাক্‌লে, তোমাদেরও ঐরূপ হ'তো। (মেজবৌদিদিকে পেরে উঠ্‌বার যো নাই)। কিন্তু সে যা হোক্, তুমি কিছু ভেবো না। তোমায় আবার ব'ল্‌চি, তুমি দুটি দিন সবুর কর; তার পরেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। ঠাকুরপো, আমরা মেয়ে চিনি; যোগমায়ার মতন মেয়ে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।" এই কথা বলিতে বলিতে বৌদিদি সহসা থামিলেন এবং নীচে মতির ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, তুমি ভাই, এখন ব'সো। খোকা কি জন্য বায়না ধ'রেচে, একবার দেখে আসি।—আর তুমি মিছেমিছি নানা কথা ভেবে মন খারাপ ক'রো না। যোগমায়ার মতন বৌ পেয়েচো

ব'লে, তুমি একদিন আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে ক'র্‌বে। একথা আজ আমি ব'ল্‌চি; আবার আমার কথা যখন সত্যি হ'বে, তখন তুমি আমাকে ব'লো।”

মেজবৌদিদি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য স্নেহ করিতেন। তিনি আমার মনের অবস্থাও বেশ বুঝিতে পারিতেন। আমার প্রকৃতি যে কিছু একগুঁয়ে, তাহা তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি সময়ে সময়ে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৌশলক্রমে আমার মনের সঞ্চিত বাষ্পরাশি দূরীভূত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। স্নেহময়ী বৌদিদির সুমধুর সুসঙ্গত বাক্যে আমার সন্তপ্তমন অনেক সময়ে সুশীতল হইত। অদ্যও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া আমার মনে একটী শান্ত সুস্নিগ্ধভাব উপস্থিত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল, হয়ত আমি বিরক্তি দেখাইয়া যোগমায়ার কোমল হৃদয় ব্যথিত করিতেছি; হয়ত, আমি অন্যায় অভিমান ও বিরাগ প্রকাশ করিয়া,আমাদের এই উদ্ভিন্ন নবজাত প্রেম অঙ্কুরেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। এই কথা মনে হইবা মাত্র, আমার হৃদয়ে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, আমি নিশ্চিত অতীব দুর্ব্বৃত্ত ও হৃদয়হীন এবং সংসারধর্ম্মপালনের একান্ত অনুপযুক্ত। সহসা চক্ষু বাষ্পসমাকুল হইল এবং আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম “ভগবন্, আমি কি করিতেছি? আমাকে কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া দাও; আমার মান অভিমান চূর্ণ করিয়া দাও; আপনা ভুলিয়া পরকে সুখী করিবার শক্তি আমাকে প্রদান কর। রক্ষা কর, দেব, আমাকে রক্ষা কর।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি আমার কক্ষে বসিয়া বিষণ্ণমনে এইরূপ আত্মগ্লানিতে নিমগ্ন, এমন সময়ে যোগমায়া মৃদুপদসঞ্চারে একপাত্র পানীয় জল লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। যোগমায়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহা যেন বিষাদবিজড়িত এবং বিষাদবিজড়িত বলিয়াই তাহা যেন এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভাবাপন্ন। কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি হৃদয়ের গভীর কাতরতা পরিব্যক্ত করিতেছিল। যোগমায়াকে দেখিয়াই আমি বিষণ্ণভাবে বলিলাম "কার জন্যে জল, যোগমায়া ?"

যোগমায়া বলিল "তোমার জন্যে। মেজদিদি যে জল নিয়ে তোমার কাছে আমায় আস্‌তে ব'ল্‌লে।"

কথা শুনিয়াই আমার চক্ষু হইতে টস্ করিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। করুণাময়ী মেজবৌদিদির গভীর স্নেহঋণের কখনও পরিশোধ করিতে পারিব কি ?

আমার চক্ষে হঠাৎ জল দেখিয়া যোগমায়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে কাতরবদনে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে

বাষ্পাকুলনেত্রে বলিতে লাগিল "দেখ, আমি তোমার নিকটে অনেক অপরাধ ক'রেচি; তুমি আমায় ক্ষমা কর। অভাগিনী আমি, তোমার মনে অনেক কষ্ট দিচ্চি; আমার আর বেঁচে থাক্‌তে নেই। তুমি যদি এমনতর কর, তা হ'লে আমার মরণ ভাল।" যোগমায়া আর বলিতে পারিল না। বামহস্তে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "যোগমায়া, তুমি চোখের জল ফেলে আমার মনে আর বেশী কষ্ট দিও না। তুমি আমার নিকট অপরাধিনী নও; আমিই তোমার নিকট অপরাধী। আমি তোমার উপযুক্ত নই; আমি নরাধম। আমি যখন তোমার মতন স্ত্রী পেয়েও সুখী হ'তে পারি নাই, তখন সে দোষ তোমার নয়, আমার।"

যোগমায়া আমার কথার কোনই উত্তর না দিয়া অঞ্চলে মুখচক্ষু আবৃত করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিল।

এই দৃশ্য আমার চক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "যোগমায়া, ক'র্‌চো কি? তুমিও যেমন পাগল, আমিও তেমনি পাগল, দেখ্‌চি। কোথাও কিছু নাই, দুইজনে কেবল কাঁদ্‌চি! কেন? কিসের কান্না? কি হ'য়েচে কি?" আমার কণ্ঠস্বর সহসা পরিহাস-সূচক হইয়া উঠিল।

আমার কথা শুনিয়া, যোগমায়া মুখ হইতে অঞ্চল ঈষৎ সরাইয়া লইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়ারও হাসি আসিল; কিন্তু হাসিটি লুকাইবার জন্য সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু আবার আবৃত করিল। আমি বলিলাম "ও আবার কি? আবার কোন নূতন পালা আরম্ভ হ'বে না কি?" এই বলিয়া তাহার বামহস্ত ও অঞ্চল ধরিলাম।

যোগমায়া কোপের অভিনয় করিয়া বলিল "যাও; তুমি কেবল

হাসি তামাসা ক'র্‌তেই ভালবাস। তোমার মনে কিছু হয় নি, বুঝি ? এই যে ক'দিন তুমি আমার সঙ্গে একটীও কথা কও নি ; সারাটি দিন কেবল বনেজঙ্গলে ব'সে আছ ; বাড়ীতে একদণ্ডও দাঁড়াচ্চো না। এখন আবার কাঁদ্‌ছিলে। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নি, বুঝি ?"

আমি হাঁসিয়া বলিলাম "তোমার অনুযোগ কতকটা সত্যি বটে ; আমার মনটা মাঝে মাঝে বড় খারাপ হয়। খারাপ হ'লেই, আমার বনজঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না। আমি তখন একাকী থাক্‌তেই ভাল বাসি, কারুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কই না। কিন্তু, তুমি থাক্‌তে আমার মন যে খারাপ হয়, এইটিই বড় আশ্চর্য্যের কথা।"

যোগমায়া মুখখানি আবার বিষণ্ণ করিয়া বলিল "আশ্চর্য্যের কথা আর কি ? আমারই মন্দ কপাল !"

আমি বলিলাম "যোগমায়া, সকলই মন্দ কপালের উপর ফেলে দিলে হয় না। ইচ্ছা ক'র্‌লে, তুমি আমি উভয়েই খুব সুখী হ'তে পারি।"

যোগমায়া বলিল "তা আমার কি ইচ্ছে নয় যে, তোমাকে সুখী করি ? কি ক'র্‌লে তুমি সুখী হও, আমাকে তা ব'লে দাও ; আমি তা যথাসাধ্যি ক'র্‌বো।"

আমি বলিলাম "যোগমায়া, একথা বলা তোমারই উপযুক্ত বটে। তুমি যদি আমার সঙ্গে মনখুলে কথা কও, তা হ'লেই আমি সুখী হই। তুমি যে ভাল ক'রে আমার কথার একটীও উত্তর দিতে চাও না, এতেই তো যত কষ্ট। আমি এত লেখাপড়া শিখে, জীবনের কোনও উদ্দেশ্য সাধন ক'রে সুখী হ'বার জন্যেই, এই পলাশ-বনে এসে বাস ক'রেচি। আমি তোমাকে সে সব কথা ব'ল্‌তে চাই। তোমাকে সে সব কথা শুনিয়ে, তোমারও মনের কথাগুলি জান্‌তে চাই। তার পর যদি দেখ্‌তে পাই, তুমি আমার জীবনের উদ্দেশ্যটি বঝ্‌তে পেরে, আমার সঙ্গে সংসার-

ধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে প্রস্তত হ'য়েচো, তা হ'লে আমার মত সংসারে আর সুখী কে?"

যোগমায়া বলিল "তুমি যে জন্যে পলাশবনে এসে বাস ক'রেচো, তা আমি বাবার কাছে শুনেচি। বিয়ের আগেই বাবা মার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে একদিন কথা ক'চ্ছিলেন। তুমি যে এত লেখাপড়া শিখে, চাক্‌রী বাক্‌রী না ক'রে, অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হ'য়ে, নিজের ও পরের যথাসাধ্য উপকার ক'র্‌বে ব'লে, এখানে এসে বাস ক'রেচো, এই কথা মাকে ব'লে বাবা তোমার খুব প্রশংসা ক'র্‌ছিলেন। বিয়ের পরেও বাবা আমাকে ব'লেছিলেন "দেখো, মা, তুমি যেন—তুমি যেন—ওঁর মনে কোনও কারণে কষ্ট দিও না।" তা আমার কি সে সব কথা মনে নেই? তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌বো। তোমাকে সুখী ক'র্‌তে না পার্‌লে, আমার বেঁচে ফল কি?"

যোগমায়ার কথা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। আমি কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া বলিলাম "যোগমায়া, অনর্থক আমি তোমার উপর রাগ ক'রে ভগবানের নিকট অপরাধী হ'য়েচি। তা যাই হো'ক্‌, তুমি যখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য জেনেচো, তখন আমি তোমাকে আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা ব'ল্‌তে চাই না। তবে আমি কেবল একটীমাত্র কথা ব'ল্‌বো। আশা করি, তুমি তা শুন্‌বে। কথাটি এই ঃ—আমি অনেক লেখা পড়া শিখেচি বটে; কিন্তু আমি বড় দরিদ্র। আমার সমান যাঁরা লেখা পড়া শিখেচেন, তাঁরা অনেক টাকা রোজগার ক'রেন আর বড়লোকের চাল চলনে থাকেন। তাঁদের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের গায়ে অনেক মূল্যবান্ অলঙ্কার; তাঁদের অনেক দাস, দাসী। তাঁদের কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু আমার যে অবস্থা, তা'তে

যে তোমাকে ইচ্ছেমত অলঙ্কার দিয়ে সুখী ক'র্‌তে পার্‌বো, তার সম্ভাবনা—"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই, যোগমায়া আমায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "তোমার ও কি ধারার কথা? আমি অলঙ্কারের জন্য তোমায় কখনও কিছু ব'লেচি না কি? আমার বাবাকেও তো লোকে খুব পণ্ডিত বলে। আমার বাবা কি বড়লোক? আমার মার হাতে দুখানি শাঁখা ভিন্ন তুমি কখনও আর কিছু দেখেচো কি? আমিও কোন অলঙ্কার চাই না। আমার হাতে দুখানি শাঁখা থাক্‌লেই যথেষ্ট। গয়না প'র্‌তে আমার লজ্জা করে। মেজদিদিই আমাকে জোর ক'রে অলঙ্কার পরিয়ে দেয়। আমি গয়না প'র্‌তে চাই না। আমিও শাঁখা প'র্‌তেই ভালবাসি।"

যোগমায়ার কথা শুনিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম, তাহা আমি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। আমি দেখিলাম, যোগমায়া যে কেবল দেবরূপিণী, তাহা নহে; যোগমায়া দেব-হৃদয়া!

কিয়ৎক্ষণ দুইজনে নির্ব্বাক্‌ রহিলাম। পরে অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশে আমি যোগমায়াকে বলিলাম "যোগমায়া, তুমি সেদিন আমায় ব'লেছিলে যে, তুমি তোমার বাবার কাছে রঘুবংশের দশম হ'তে পঞ্চদশ সর্গ পর্য্যন্ত প'ড়েচো, আর বাল্মীকি-রামায়ণেরও কিছু কিছু প'ড়েচো। কই, আমাদের বাড়ী এসে যে আর পড়া শুনো কর না?"

যোগমায়া বলিল "বাবা তো তোমার কাছে প'ড়্‌বার জন্যে আমায় ব'লেছিলেন। কিন্তু তোমার কাছে প'ড়্‌বো কি, তোমায় তো বাড়ীতে দণ্ডও দেখ্‌তে পাই না। আচ্ছা, দুপুর বেলায় তুমি বনের মধ্যে গিয়ে গাছতলায় শুয়ে ঘুমোও না কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কেন ? সেই,সে দিনকার কথা মনে প'ড়্‌চে নাকি ?"

যোগমায়া বলিল "তা পড়ে না ? আমরা তোমার অবস্থা দেখে বড় ভয় পেয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, যোগমায়া, তখন কি তুমি একবারও ভেবে-ছিলে যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বে ?"

যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া চক্ষুদুটী অবনত করিয়া ঘাড় নাড়িল।

আমি বলিলাম "তোমাকে প্রথম থেকে দেখে অবধি, আমার কিন্তু দু' একবার তোমাকে বিয়ে ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'য়েছিল।"

যোগমায়া স্বপদে চক্ষু নিহিত করিয়া সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং লজ্জা আসিয়া তাহার শুভ্র গণ্ডস্থল রঞ্জিত করিয়া দিল। যোগ-মায়ার এই লজ্জানম্র মূর্ত্তিখানি আমার চক্ষে বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

আমি অনিমিষনেত্রে কিয়ৎক্ষণ এই পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগি-লাম। সহসা হৃদয় মধ্যে ভাবের একটী প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কত মাধুর্য্য, কত পবিত্রতা, কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কত সৌন্দর্য্য-রাশি হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইল। ভাবি-লাম, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যোগমায়ার সান্নিধ্যে যে এত সুখ ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমি একটী দিনও অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। বুঝিলাম, আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে; আজ আত্মা আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়াছে; আজই আমাদের প্রকৃত বিবাহ!

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহরের সময় আমি আর অরণ্যবাস করিতাম না। শ্রীমতী যোগমায়া দেবীই আমাকে গৃহবাসী করিয়া তুলিলেন। আহারাদির পর প্রায় প্রত্যহই যোগমায়া বৃদ্ধ বাল্মীকিকে হস্তে লইয়া আমার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিত। যোগমায়া অযোধ্যাকাণ্ড শেষ করিয়া আমার সহিত আরণ্যকাণ্ড পড়িতেছিল। সূর্য্য যেরূপ গগনমণ্ডলে প্রবেশ করেন, ভগবান্ রামচন্দ্রও সেইরূপ দেবরূপিণী জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত মৃগ-পক্ষিসেবিত ব্রহ্ম-ঘোষ-নিনাদিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন, এই শ্লোকটি হইতে যে দিন আমরা পাঠ আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের উভয়েরই হৃদয়ে যেন স্বয়ং বীণাপাণির পাণিলাঞ্ছিত বীণারই অমৃতময় ঝঙ্কার হইতে লাগিল। পাঠ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে আমাদের ইচ্ছা হইত না। কোন কোনদিন মেজ-বৌদিদিও আসিয়া রামায়ণের অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেন; কিন্তু তিনি, বুদ্ধিমতীর ন্যায়, আমাদিগকে প্রায়শঃ "একাকী"ই থাকিতে

দিতেন। একদিন পাঠ শেষ হইলে, সীতাদেবীর অলৌকিক বনবাস-স্পৃহার উল্লেখ করিয়া আমি যোগমায়াকে বলিলামঃ—

"যোগমায়া, সেদিন তোমরা বনে বেড়াতে গিয়ে কতই না ভয় পাচ্ছিলে। এখন সীতাদেবীর কথা প'ড়্‌লে তো? দেখ্‌লে, তিনি স্বামীর সঙ্গে বনে বেড়া'তে একটী দিনও ভয় পান নাই! কতবার রাক্ষস দেখে, এবং একবার রাক্ষসের হাতে প'ড়েও তাঁর বনভ্রমণপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত না হ'য়ে বরং দিন দিন বেড়েই উঠেছিল। পঞ্চবটীবনে তিনি যে কেমন সুখে কালযাপন ক'রেছিলেন, তা তো দেখ্‌লে? তাঁর সঙ্গে, এ দেশের —এ দেশের কেন?—কোন দেশেরই মেয়ের তুলনা হয় না।"

যোগমায়া বলিল "তা সত্যি বটে; কিন্তু তুমি সেদিনকার কথা ব'ল্‌ছিলে; কই সেদিন তো আমার কিছু ভয় হয় নেই? মঙ্গলা ঠাকুর্জ্জি, রাজু ঠাকুর্জ্জি, আর মেজদিদিই তো ভয়ে জড়সড় হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছিল। আমি ফুল তুল্‌তে রোজই তো বনে যেতুম, তা কি তুমি দেখ নি? বনে বেড়াতে ভয় পেলে, আমি কি কখনও বনের মধ্যে ফুল তুল্‌তে আস্‌তে পার্‌তুম? আর তুমি সীতার কথা ব'ল্‌চো। আমি যখন ছেলেবেলায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়্‌তুম, তখন সীতার কথা প'ড়ে—"

যোগমায়া আর বলিতে পারিল না। কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া সহসা তাহার মুখরোধ করিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম "থাম্‌লে যে! সীতার কথা প'ড়ে তোমার মনে কি হ'তো, তাই বল না?"

লজ্জায় যোগমায়ার আর কথা সরিল না। বলিল "যাও, আমি জানি না।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম "আবার তোমার সেই 'জানি না'?"

এই সময়ে সেই স্থলে সুশীলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলাকে দেখিয়া যোগমায়া বলিয়া উঠিল "ঐ সুশীলাকে জিজ্ঞেস্ কর।"

আমি বলিলাম "এ বন্দোবস্ত মন্দ নয়! কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতার কথা প'ড়ে তোমার মনে কি হ'তো, তা সুশীলা ব'লে দেবে! সুশীলাকে মনের কথা ব'ল্‌তে না কি?—কি সুশীলা, রামায়ণে সীতার কথা প'ড়ে তোমার দিদির মনে কি হ'তো, তা তুমি জান না কি?"

সুশীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "তা আমি কেমন ক'রে জান্‌বো!" কিয়ৎক্ষণ যেন ভাবিয়া সে বলিয়া উঠিল "কি, দিদি, তুই সেই যে মাকে ব'ল্‌তিস্ 'আমি সীতার মতন হ'ব', সেই কথা নাকি?—ও, দেবেন বাবু, দিদি ব'ল্‌তো কি, 'আমিও যদি সীতা হ'তুম, তা হ'লে আমিও বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বনে যেতুম।' দিদি, এই শ্লোকগুলি প্রায়ই বলে, আর আমাকেও তা' মুখস্থ করিয়েচে। তুমি তা শুন্‌বে?"

যোগমায়া মহাবিপদে পড়িল; তাহার গণ্ড ও কপোলদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ভৎর্সনার চক্ষে সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিল "দূর, পোড়ার-মুখি, তোর মুখে আগুন; তুই এখানে ম'র্‌তে এসেচিস্?"

দিদির ভৎর্সনা শুনিয়া সুশীলার দুষ্টামী আরও বাড়িয়া উঠিল। সে খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল "দেবেন বাবু, দিদির শ্লোকগুলি তুমি মন দিয়ে শোন; তোমায় সব ব'ল্‌চি।" এই বলিয়া আনন্দময়ী সুশীলা মৃদুস্বরে মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল:—

"শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতা,
বিষম দণ্ডক বনে না যাইও সীতা।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস?

অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক নানা সুখে ;
ফলমূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ?
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল ;
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ-কমল।
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃত আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেল হেন বুঝ মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে।
চিন্তা না করিহ কান্তা, ক্ষান্ত হও মনে ;
বিষম রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন শ্রীরামে কিছু মনের সন্তাপে।
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন শঙ্কা কর সাথে লইতে আমায় ?
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে,
বীর বলি কোন্ জন তাহারে বাখানে ?
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে,
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সহ থাকি যদি ধূলো লাগে গায়,
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়।
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল,
রম্য অট্টালিকা নহে তার সমতুল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন,
তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ।”

আমি বলিলাম "বাঃ সুশীলা, বাঃ! এই গুলি তোমার দিদির শ্লোক নাকি? তোমার দিদি আরও শ্লোক জানে না কি? তুমি আর কোন শ্লোক মুখস্থ ক'রেচো?"

সুশীলা হাসিতে হাসিতে বলিল "ক'রেচি বই কি? সেগুলি সংস্কৃত শ্লোক। তাও শুন্‌তে চাও?"

আমি বলিলাম "শুন্‌বো না কেন? শুন্‌বার জন্যেই তো তোমায় ব'ল্‌চি।"

সুশীলা বলিল "তবে শোন" এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অতিশয় সুন্দর সুরে উচ্চারণ করিলঃ—

"কল্যাণবুদ্ধে রথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ॥

"উপস্থিতাং পূর্ব্বমপাস্য লক্ষ্মীং
বনং ময়া সার্দ্ধ মসি প্রপন্নঃ।
তদাস্পদং প্রাপ্য তয়াতি রোষাৎ
সোঢ়াস্মি ন ত্বদ্ভবনে বসন্তী॥

"নিশাচরোপপ্লুত-ভর্ত্তৃকাণাং
তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ।
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যাং
কথং প্রপৎস্যে ত্বয়ি দীপ্যমানে॥

"কিম্বা তবাত্যন্ত বিয়োগ-মোঘে
কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেঽস্মিন্।
স্যাদ্রক্ষনীয়ং যদি মে ন তেজঃ
ত্বদীয় মন্তর্গত মন্তরায়ঃ॥

"সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিঃ
ঊর্দ্ধং প্রসূতে শ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥"*

---

* তুমি হে কল্যাণবুদ্ধি, নিকটে তোমার
ধর্ম্মে পরি শঙ্কা নাহি করি কামচার।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি অতি পাপীয়সী,
সে কারণে সহিতেছি এত দুঃখরাশি।
পূর্ব্বে মোরে সাথে ল'য়ে তুমি গেলা বনে,
করলব্ধ রাজ্যলক্ষ্মী ঠেলিয়া চরণে;
সেই রোষে লক্ষ্মী আজি, লভিয়া তোমায়,
তব গৃহে মম বাস, সহিলা না হায়!
বনে যবে ছিনু মোরা, প্রসাদে তোমার
মুনিপত্নীগণে আসি নিকটে আমার,
মাগিত শরণ মম, না পারি সহিতে,
ভর্ত্তাদের অপমান রাক্ষসের হাতে।
তুমি বিদ্যমানে আজি কাহার শরণ,
অভাগিনী ল'ব আমি, ধিক্‌রে জীবন!
হায় রে, যদ্যপি আজি তব বংশধরে,
রক্ষিতে না হ'তো এই গর্ভের ভিতরে,

কি সুন্দর! কি মধুর! কি চমৎকার! সুশীলার মধুময় কণ্ঠে এই শ্লোকগুলি তানলয়ে উচ্চারিত হইয়া যেন কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি বিস্ময়ে, আনন্দে, উল্লাসে, কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। পরে সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "সুশীদিদি, তুই যে সুন্দর শ্লোক শুনিয়ে আজ আমাকে আনন্দিত ক'রেচিস্, তার পুরস্কার তোকে যে কি দেব, তা আমি ব'ল্‌তে পারি না। আয়, তোকে একবার কোলে করি।" এই বলিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিলাম।

আমার এই অদ্ভুত ভঙ্গী দেখিয়া ও প্রস্তাব শুনিয়া সুশীলা হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ নীচে পলাইয়া গেল। আমি সুশীলার কার্য্য দেখিয়া প্রথমে সহসা কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চমক্ ভাঙ্গিল। চমক্ ভাঙ্গিবামাত্র বড়ই অপ্রতিভ হইলাম। দেখিলাম, আমার ভঙ্গী ও প্রস্তাব কেবল যে অদ্ভুত, তাহা নহে; পরন্তু তা। কিম্ভূতকিমাকার এবং সুশীলার পক্ষে ভীতিজনকও বটে!

যোগমায়া আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এইবার যো পাইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল "তুমি ক্ষেপেচো না কি?"

আমি একটু গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিলাম "ক্ষেপারই কাছাকাছি বটে; অমন সুন্দর মেয়ের মুখে অমন সুন্দর শ্লোক শুন্‌লে ক্ষেপে যেতেই

তা হ'লে বিয়োগ-দুঃখে ঘৃণিত জীবন,
করিতাম অকাতরে, আজি বিসর্জ্জন।
প্রসবের অন্তে তাই, করিয়াছি মনে,
করিব কঠোর তপ, চাহি সূর্য্যপানে;—
জন্মে জন্মে তুমি মম স্বামী হ'ও যেন,
না ঘটে বিরহ আর, দুর্ব্বিষহ হেন।

রঘুবংশ; চতুর্দ্দশ সর্গ।

হয় দেখ্‌চি। তুমি তো আবার সুশীলার দিদি! সুশীলাকে এই শ্লোক-গুলি মুখস্থ করিয়েচো! বাপ্‌রে, তোমার মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুন্‌লে, দেখ্‌চি, মারাত্মক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। মেয়েমানুষের সঙ্গে আমার আর সংস্কৃত টংস্কৃত পড়া হ'বে না। বাঙ্গালা প'ড়্‌তে চাও, রাজি আছি। সংস্কৃতের দিক্‌ দিয়ে আমি আর যাচ্চি না, বাবা!"

আমার কথা শুনিয়া, যোগমায়া ব্রীড়ানতবদনে কেবল হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম "যোগমায়া, তুমি হেঁসে আর আমায় ভুলোতে পার্‌চো না। বলি, তোমার পেটে এত গুণ? কই একটী দিনও তো আমায় তা জান্‌তে দাও নাই? এই টুকুই তো আমি জান্‌তে চাচ্ছিলুম। —তুমি কিন্তু আমায় কিছু ব'ল্‌বে না, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি। সুশীলার সঙ্গে ভাবটা একটু পাকাপাকি ক'র্‌তে হ'চ্চে। তা নইলে কিছু টের পাব না। সুশীদিদি খাসা লোক।"

ঠিক্‌ এই সময়ে মেজবৌদিদি উপরে আসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন "কি, ঠাকুরপো, কি হ'চ্চে? সুশীলাকে ধ'র্‌তে যাচ্ছিলে কেন?"

আমি বলিলাম "কই?" মেজবৌদিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কই? এই যে সুশীলা দৌড়ে যাচ্ছিল; তাই দেখে আমি বল্লুম 'সুশী, কোথা দৌড়ে যাস্‌?' সুশীলা হেসে বল্লে 'দেবেন বাবু আমায় ধ'র্‌তে আস্‌চে।' এই ব'লে সে তো এক নিশ্বেসে পগার পার হ'য়ে গেল। বলি, ঠাকুরপো, তোমাদের ব্যাপার খানা কি হ'চ্চে?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "ব্যাপার আর কি হ'বে? সুশীলার মুখে সংস্কৃতশ্লোক শুনে আমি বড় খুসী হ'য়েছিলাম।"

মেজবৌদিদি বলিলেন "এই? আঃ আমি বাঁচ্‌লুম ভাই! আমি তো

সুশীলার ভাবগতিক দেখে মনে করেছিলুম, বুঝি বা আমাদের বাড়ীতে আবার সুন্দ উপসুন্দের অভিনয় হয়! যতীন তো সুশীলার জন্যে ক্ষেপে উঠেচে; আবার তুমিও যদি তাকে ধ'র্‌বার জন্যে পেছনে পেছনে দৌড়ুতে থাক, তা হ'লে তো আর কিছু রক্ষে থাকে না দেখ্‌চি!"

আমি মেজবৌদিদির কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "বৌদিদি, তোমাকে কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারি, সে সাধ্যি আমার নাই।"

মেজবৌদিদি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, এখন থাক্ সে কথা? বলি, এখন তোমরা সুশীলার সঙ্গে যতীনের বিয়ে দিতে মত ক'র্‌চো?"

আমি বলিলাম "বিয়ের জন্যে এখন এত তাড়াতাড়ি কেন, বৌদিদি? সুশীলা তো মোটে এই নয় বছরের। আরও কিছুদিন যাক্।"

মেজবৌদিদি বলিলেন "আরও দুই এক বছর গেলে কোন দোষ যে নেই, তা আমি মানি। কিন্তু কথা বার্ত্তা ক'য়ে রাখ্‌তে হানি কি? কাল যোগমায়ার সঙ্গে আমি ওদের বাড়ী গেছ্‌লুম। পিসীমা ব'ল্‌ছিল, 'যোগমায়ার জন্যে পাত্র খুঁজ্‌তে বড় কষ্ট হ'য়েছিল; যেমন আমার যোগমায়া, তেমনই, বাছা, রামের মতন আমার জামাই হ'য়েচে। এখন আমার সুশীলাটির একটী ভাল পাত্র জুটে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।' পিসীমা এই ব'লে যতীনের কথা পাড়্‌লে। আমি বল্লুম 'পিসীমা, তোমরা যতীনকে ঠিক্ ক'র্‌বার অনেক দিন আগেই, সুশীলা তাকে পছন্দ ক'রে রেখেচে। তার জন্যে তোমাদের আর ভাব্‌তে হ'বে না।' আমার কথা শুনে পিসীমা হাস্‌তে লাগ্‌লো। বলি, ঠাকুরপো, বরক'নের তো পরস্পরের পছন্দ হ'য়েচে, এখন তোমরা না এগুলে যে কিছুই হ'বে না।"

আমি বলিলাম "বেশ কথা বৌদিদি। বাবা বাড়ী আসুন; তিনি এলে আমি তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা ক'ব।"

বৌদিদি বলিলেন "বেশ, আমিও ঠাকুরকে ব'ল্‌বো।" এই কথা

বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার কি মনে হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন "ঠাকুরপো, আজকাল তুমি বনের মধ্যে যে বড় একটা ব'সে থাক না? তুমি বন বড় ভাল বাস্‌তে না? ছিঃ ছিঃ, ঘরের মধ্যে দিবারাত্রি ব'সে থাক্‌লে কু'নো হ'য়ে প'ড়্‌বে যে!—বাপ্‌রে,যোগমায়ার পেটে যে এত গুণ ছিল,তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না! মনে ক'র্‌তুম্, বুঝি সাদাসিদে উদোমাদা মানুষটি! হ্যাঁলো যোগমায়া, বলি, তুই কি মন্তর্ শিখেচিস্ লো! এত বড় বনমানুষটাকেও বশীভূত ক'রে ফেল্‌লি? যাই হো'ক্,তোর খুব বাহাদুরী আছে, ব'ল্‌তে হ'বে!"

আমি হাসিয়া বলিলাম "বৌদিদি, তোমাকে বুঝে উঠি, সে সাধ্য আমাদের নাই।—কিন্তু বাহাদুরী তো তোমারই! যোগমায়া আর বাহাদুর কিসে?"

মেজবৌদিদি হাসিয়া বলিলেন "এখন যা বল।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ সুখ ও আনন্দে পলাশবনে আমাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। পিতৃদেব নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না; কোনও কার্য্যবশতঃ, গৃহে ফিরিতে তাঁহার আরও দুইমাস বিলম্ব হইবে, এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। যতীন ভায়া বি-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এম্-এ পড়িতে যাইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু আমার নিকট অধ্যয়ন করিবার সুবিধা থাকায়, সে আমারই অনুরোধক্রমে পলাশবনে আরও কিছুদিন থাকিতে সম্মত হইল।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্র প্রায়ই পাইতাম। কিন্তু তাহার পত্র পাঠ করিয়া আমি প্রতিদিনই সমধিক শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলাম। তাহার রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছিল। এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে থাকিয়াও তাহার কিছুই উপকার হইল না। শরীর রুগ্ন থাকায়,তাহার মনেও কিছুমাত্র স্বচ্ছন্দতা ছিল না। বিশেষতঃ,

বিদেশে ও আত্মীয়-স্বজন-শূন্য স্থানে তাহার কষ্টের অবধি ছিল না। সত্যের একান্ত ইচ্ছা, সে স্বদেশে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু কলিকাতায় কিম্বা হুগলীতে থাকিলে পাছে তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়, এই নিমিত্ত চিন্তাকুল হইতেছিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে তাঁহাকে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন দেখিয়া আমি লিখিয়াছিলাম "দেশে আসিবার জন্য তোমার যদি একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার বিবেচনায় তোমার কলিকাতা বা হুগলীতে থাকা কোনমতেই উচিত নহে। তুমি বঙ্গদেশের মধ্যে দুই তিনটি স্থানে থাকিতে পার, হয় বৈদ্যনাথে, নয় গিরিধিতে কিম্বা আমাদের এখানে। পূর্ব্বোক্ত দুই স্থান তোমার পক্ষে আগ্রা ও এলাহাবাদের তুল্যই হইবে, যেহেতু সেখানে তোমার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। এইজন্য, আমাদের যুক্তিতে পলাশ-বনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। বলা বাহুল্য, ইহা তোমারই গৃহ এবং আমরাও তোমাকে পরম যত্নে ও সুখে রাখিতে চেষ্টা করিব। জননীদেবীর ইচ্ছা, তুমি আমাদের এখানেই আইস। তিনি তোমাকে আমা হইতে বিভিন্ন ভাবেন না। তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছেন এবং প্রায়ই তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি।

এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু অনেক দিন কোনই উত্তর পাইলাম না। অবশেষে সহসা একদিন তারযোগে একটী সংবাদ পাইলাম। সংবাদের মর্ম্ম এই:—"পলাশবনেই যাওয়া স্থির; আগামী পরশ্ব সন্ধ্যা-নাগাদ পহুঁছিব।" জননীদেবী সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সত্যেন্দ্র যতীনের অধ্যাপক; তাহার তো আনন্দিত হইবারই কথা। যোগমায়া এবং মেজবৌদিদিরও প্রচুর আনন্দ হইল।

যথা সময়ে সত্য পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অপরাহ্ণ

সময়। পশ্চিমদিকের শালবৃক্ষরাজির অন্তরালে সূর্য্যদেব লুকায়িত হইয়াছিলেন। বর্ষারম্ভ হইলেও আকাশ মেঘমুক্ত ছিল এবং স্নিগ্ধ ও সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। বলা বাহুল্য, আমার গৃহের সম্মুখস্থ ক্ষেত্রটি শ্যামল সুকোমল তৃণদলে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং কোথাও কর্দ্দমের লেশমাত্র ছিল না। সত্যের শিবিকাটি ধীরে ধীরে গৃহ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শিবিকার দ্বার রুদ্ধ; তাহা খুলিয়া সত্য বাহির হইল না। তাহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া আমি দ্বার খুলিলাম। খুলিয়া দেখিলাম, সত্য নিদ্রিত; তাহার দেহখানি যারপর নাই কৃশ ও দুর্ব্বল। দেহে রক্ত নাই; মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিলে সহসা তাহাকে চিনেতে পারা যায় না। সত্যের আকার প্রকার দেখিয়া বড় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইলাম এবং মৃদুস্বরে ডাকিলাম "সতু।"

সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল, কিন্তু আমাদিগকে সহসা চিনিতে না পারিয়া যেন বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই বলিয়া উঠিল "কে ভাই দেবু! আমি পলাশবনে এসেচি না কি?' ধন্য পরমেশ্বর! ভাই, তোমাদের সঙ্গে আর যে দেখা হ'বে, তা' আমি ভাবি নাই। এখন একবার পিসীমাকে দেখ্‌তে পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তা হ'লেই আমি সুখে পেরিয়ে যেতে পার্‌বো।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল।

সত্যেন্দ্রর কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জর! বলিলাম "তুমি উঠ্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি ক'রো না। একটু স্থির হও। আমরা তোমাকে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাচ্চি।"

যতীনকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র চিনিল। যতীন ও আমি সত্যকে গাত্রবস্ত্রে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীর বারাণ্ডায় লইয়া আসিলাম। সেখানে সত্য একবার বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা

তাহাকে একখানি চেয়ারের উপর বসাইলাম। সত্যেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া একবার সম্মুখের দৃশ্যটি দেখিল। দেখিয়া যেন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল "এ যে সত্যি সত্যিই ঋষিদের আশ্রম! এমন সুন্দর স্থান তো কোথাও দেখি নাই। ভাই, এখন বুঝেছি, তুমি সব ছেড়ে এই খানেই প'ড়ে আছ কেন! ভাল ক'রেচো, ভগবান্ তোমার মঙ্গল ক'র্‌বেন। আমি পাপী; তাই কষ্ট পাচ্চি। কিন্তু সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যা, তাই হো'ক।" এই বলিয়া সত্যেন্দ্র চিন্তামগ্ন হইল।

আমি বলিলাম "ঠাণ্ডা বাতাসে এখানে আর ব'সে থেকে কাজ নাই। তুমি বিছানায় শোবে চল।"

সতু বলিল "আমার চাকর গদাই কি এখনও আসে নাই? এখানে কোথায় তার বোন্ আছে; তারই সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেল না কি?"

আমি বলিলাম "তোমার চাকর এখনও এসে পৌঁছে নাই। কিন্তু তোমার কি প্রয়োজন, বল। এখানেও চাকর আছে। আর, আমরাই তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্চি, চল।" এই বলিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে উপরের ঘরে লইয়া গেলাম। আমার পাঠ-গৃহটি একপ্রান্তে অবস্থিত এবং আয়তনেও বৃহৎ ছিল বলিয়া, আমি তাহাই সত্যের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম। তাহার ভিতর হইতে চারিদিকের শোভাও অতিশয় সুন্দর দেখায়।

সত্য উপরের ঘরে উঠিতে উঠিতে বলিল "আমাকে, ভাই, নীচে বাইরের ঘরে রাখ্‌লে না কেন? সেখানেই বেশ থাক্‌তুম। উপরের ঘরে থাক্‌লে, মেয়েদের একটু অসুবিধা হ'তে পারে।"

আমি বলিলাম "তোমার জন্য যে ঘর নিরূপিত ক'রেচি, সেখানে মেয়েদের যাবার কোনই দরকার হয় না। আর দরকার হ'লেও, এই

বর্ষার সময় তোমার নীচের ঘরে থাকা তো কোনমতেই উচিত নয়। তুমি ওর জন্যে কিছু ভেবো না।"

সত্য বিছানাতে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিয়া জানালার ভিতর দিয়া চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিল; তাহার পর বসিয়া থাকিতে কষ্ট হওয়ায়, শয়ন করিল। আমি বলিলাম "জ্বরে জ্বরে যে তোমার এরূপ অবস্থা হ'য়েচে, তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি মনে করেছিলাম, শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় একবার হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যেই তুমি পশ্চিমে গিয়েচো।"

সত্য বলিল "ম্যালেরিয়াই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেচে। যকৃৎ আর পিলে দুইই হ'য়েচে। রোজই বিকেলে জ্বর আসে। আজও তাই এসেচে। খানিকটা রাত্রি হ'লে, তবে জ্বর ছাড়্‌বে। পশ্চিমে গিয়ে শরীর তো কিছু সুধ্‌রালো না। আজ চার পাঁচ মাসের মধ্যে রোগের কিছুই ইতর বিশেষ দেখ্‌তে পেলাম না। একে রোগের যন্ত্রণা, তার উপর আবার নিজের লোক কেউ নিকটে নাই। গদাই যেমন পার্‌তো, তেমনই যত্ন শুশ্রূষা ক'র্‌তো। আর কে সেখানে দে'খ্‌বে বল?" এই বলিয়া সত্য নিস্তব্ধ হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল "তোমার বিয়ের সময় আমি আসতে পাল্লুম না, তার জন্যে দুঃখিত হ'য়ো না। আমি আস্‌বার খুব চেষ্টা ক'রেছিলাম; কিন্তু ডাক্তারেরা আমায় শীঘ্র এলাহাবাদ যেতে বল্লে; কি করি, প্রাণের দায়ে, ভাই, তাড়াতাড়ি চ'লে গেলাম। এখানে না আস্‌তে পারাতে, আমার বড় দুঃখ হ'য়েচে।"

আমি বলিলাম "ও কথা ভেবে তোমার দুঃখ ক'র্‌বার কোনই কারণ নাই। তোমার শরীরের এরূপ অবস্থা ঘ'টেচে, তা' আমি জান্‌তে পার্‌লে কখনই তোমাকে আস্‌তে অনুরোধ ক'র্‌তাম না। সে কথা যাক্, এখন তুমি ঔষধাদি কিরূপ ব্যবহার ক'র্‌চো?"

সত্য বলিল "এখন কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার ক'র্‌চি। কিন্তু মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখে যেতেন; এখানে কোন ডাক্তার আছেন তো?"

আমি বলিলাম "আছেন; কিন্তু পলাশবনে নাই; মাইল খানেক দূরে আছেন। তিনি একজন ভাল ডাক্তার। আমি যতীনকে তাঁর কাছে পাঠিয়েচি; তাঁকে এখনি ডেকে নিয়ে আস্‌বে।"

এই কথা বলিতে বলিতে, জননীদেবী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি বলিলাম "সত্তু, মা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।" সত্য মাকে দেখিয়াই বিছানায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু মা তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "বাবা, তুমি শুয়ে থাক; তোমার উঠ্‌বার দরকার নেই; তোমাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ ধড়্‌ফড়্‌ ক'র্‌চে। তোমার যে এত অসুখ হ'য়েচে, কই দেবু তো আমায় একদিনও বলে নি! তুমি কিছু ভাবনা চিন্তে ক'রো না,বাবা। মা ভগবতী করুন, তুমি শীগ্‌গীর্‌ আরাম হ'য়ে যাও। আমরা সবাই এখানে আছি। আর তুমি আমাকে তোমার মা ব'লেই জান্‌বে। তোমার কিছু ভয় নেই।" এই বলিয়া জননীদেবী সত্যের মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সত্যের চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি আপনাকে আমার মা, আর দেবুকে আমার ভাই ব'লেই জানি। এই জন্যেই তো আমি এখানে এলাম। আমার মা নাই, ভাইও নাই; জগতে এক পিসী ভিন্ন আমার আপনার ব'ল্‌তে আর কা'কেও দেখ্‌তে পাই না। আপনারা যে আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তা সে আপনাদের অসীম দয়া।"

সত্যের বাক্যে জননীদেবীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। পীড়িত, রোগযন্ত্রণায় কাতর, পিতৃমাতৃহীন সত্যেন্দ্রনাথের শুষ্ক মুখখানি দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া গেলেন। তিনিও পিলে ও যকৃতের কথা বলিলেন, কিন্তু সহসা যে কোন ভয়ের কারণ নাই, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন। আমার অনুরোধক্রমে, তিনি প্রত্যহ আসিয়া সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সত্যেন্দ্রের নিকটে আমি প্রায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতাম। কেবল প্রাতঃকালে দুই এক ঘণ্টার জন্য বনে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। সত্যেন্দ্র অপরাহ্ন দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত বেশ থাকিত; তৎপরেই জ্বরাসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়িত। জ্বরের সময় বেচারীর অতীব যন্ত্রণা হইত। প্রাতঃকালে, কোনও দিন ইচ্ছা হইলে, সত্যেন্দ্র নীচে নামিয়া আমাদের বাটীর সম্মুখে বনের ধারে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিত। সেই সময়ে যতীন কিম্বা আমি সঙ্গে থাকিতাম। অন্যান্য দিন সে উপরেই থাকিত। যতীন প্রায় সর্ব্বক্ষণ সত্যেন্দ্রের নিকটে থাকিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত; কথনও কথনও তাহাকে ভাল বই পড়িয়া

শুনাইত এবং সত্যেন্দ্র অনুরোধ করিলে, দুই একটী ভগবৎ-সঙ্গীতও গাহিয়া শুনাইত। যতীন বেশ গাহিতে পারিত।

একদিন দ্বিপ্রহরের পর সতু ও আমি গৃহে বসিয়া নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলাম। কথায় কথায় আমাদের বিবাহের কথা উঠিল। সতু শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমি কিরূপে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার বিবরণ তাহাকে বলিতে লাগিলাম। পরিশেষে যোগ-মায়ার উল্লেখ করিয়া বলিলাম "আমার চিরকালই আশঙ্কা ছিল, হয়ত স্ত্রী আমার মনের মত হ'বে না। কিন্তু যোগমায়াকে পেয়ে আমার সে আশঙ্কা দূর হ'য়েচে। আমার যেরূপ প্রকৃতি, তা'রও ঠিক্ সেইরূপ। যোগমায়া লেখাপড়া বেশ জানে; বাঙ্গলা তো জানেই; সংস্কৃতও রঘুবংশ পর্য্যন্ত প'ড়েচে এবং আজকাল বাল্মীকির রামায়ণ প'ড়্চে। এই পলাশবনে যে আমার ভাগ্যে এমন বৌ জুটে যাবে, তা তো ভাই আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাই হো'ক্ সবই ভগবানের কৃপা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সুখে সংসার-ধর্ম্ম পালন ক'র্‌তে পারি।"

সত্যেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া বলিল "গোস্বামী ম'শাইকে যেরূপ মহাত্মা ব্যক্তি দেখিলাম, তাঁর কন্যা যে এরূপ হ'বেন, তা বড় কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, না হওয়াই বিস্ময়ের কথা। যাই হো'ক্, তুমি যে স্ত্রীরত্ন লাভ ক'রেচো, একথা তোমার মুখে শুনে আমি বাস্তবিকই বড় সুখী হ'লাম।"

আমি বলিলাম "হাঁ, এখন তো সুখে দিন যাচ্চে। অতঃপর ভগবান্ কি ক'র্‌বেন, তা' ব'ল্‌তে পারি না। আমি তো সংসারী হ'য়েচি; এখন তুমিও ভগবৎকৃপায় শীঘ্র সুস্থ হ'য়ে সুরমার পাণিগ্রহণ ক'র্‌লে, আমরাও যার পর নাই আনন্দিত হই।"

সুরমার কথা উত্থাপন করিবামাত্র সত্য একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তামগ্ন হইল। অনেকক্ষণ পরে সে মৃদুকণ্ঠে যেন আপনা-আপনি বলিতে লাগিল "সুরমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমিও সুখী হ'তাম, সন্দেহ নাই। সুরমার মতন স্ত্রীলাভ করা ভাগ্যবানেরই কথা বটে। কিন্তু বিয়ে আর হ'বে না। না হ'য়ে ভালই হ'য়েচে। হ'লে বেচারী আজীবন কষ্ট পেতো। এও ভগবানের ইচ্ছা ও অসীম কৃপার কথা।"

আমি সত্যেন্দ্রের কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বলিলাম "সুরমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'বে না কেন? হরনাথ বাবু অন্যমত ক'রেচেন না কি?"

সত্যেন্দ্রের বিষণ্ণমুখে একটু বিকৃত হাসি দেখা গেল। সে বলিল "হরনাথ বাবু অবশ্যি এখনও অন্যমত করেন নাই। কিন্তু তাঁকে শীঘ্রই ক'র্‌তে হবে। আমার আশা ক'র্‌তে তাঁকে মানা ক'রে দেব। আমি তো মৃত্যুর দ্বারে দণ্ডায়মান। এজন্মে যে আর এই পীড়া হ'তে কখনও মুক্ত হ'তে পার্‌বো, তার আশা দুরাশামাত্র, তবে এই রকম ক'রে যতদিন যায়। একবার হরনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে, আমি তাঁকে সব কথা খুলে বলি। তিনি আমার বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁকে এই সময় একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে। তুমি তাঁকে একবার আস্‌তে লিখ্‌তে পার?"

আমি বলিলাম "তা লিখে দিচ্চি, কিন্তু তুমি ওরকম চিন্তা ক'রে মন খারাপ ক'র্‌চো কেন? তুমি মনে সাহস কর; ভগবানের কৃপায়, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি ভাল হ'য়ে যাবে; আর আশা করি, সুরমাও শীঘ্র তোমার হ'বে।"

সত্যেন্দ্র আমার কথায় যেন বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে

মাথা নাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল "সুরমার জন্যেই আমার যত দুঃখ। আমার সঙ্গে তার যে বিয়ে হবে, তা সে জেনেচে। তার মা নাকি তাকে মৃত্যুশয্যায় এই কথা ব'লে গেছেন। কথাটি জেনে অবধি সুরমার প্রকৃতির অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হ'য়েচে। তার ভাব যেন গম্ভীর ও আরও পবিত্র হ'য়েচে। আমার পীড়ার কথা শুনে, তার উদ্বেগের আর পরিসীমা নাই। এলাহাবাদে থাকিবার কালে, দুই চারি দিন অন্তর তার চিঠি পাচ্ছিলাম। আমি তোমাকে সে কথা বোধ করি লিখেও থাক্‌বো। এই ক'দিন কেবল কোনও চিঠি পাচ্চি না। বোধ হয়, এলাহাবাদ থেকে চিঠি ঘুরে আস্‌তে দেরী হ'চ্চে। আমি এখানে এসে তাকে কোন চিঠিপত্র লিখি নাই। তোমাদের দেখে সব ভুলে আছি। একখানা চিঠি তাকে লিখ্‌তে হবে।" এই বলিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ নিস্তব্ধ হইল; তৎপরে, আবার বলিতে লাগিল "লিখেই বা আর কি হবে? আমার দেহের এইরূপ অবস্থাতে তাকে আর চিঠি না লেখাই ভাল। সুরমা বয়ঃস্থা বালিকা; আমার সম্বন্ধে তার আশা নিবৃত্ত হওয়াই ভাল। যখন সে আমাকে আর ইহজগতে পাচ্চে না, তখন আমার সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাই তার পরিহার করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর ঘরের কুমারী কদাচই তো অবিবাহিত থাক্‌তে পার্‌বে না। তবে হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে চিরকালের জন্য তার অসুখী হওয়া কেন? অধর্ম্ম সঞ্চয় করা কেন? সুরমা যদি বিয়ের কথা না জান্‌তো, তা হ'লে আমি যার পর নাই সুখী হ'তাম; কিন্তু ভাই, নিশ্চিন্তমনে—সুখে-মরাও আমার ভাগ্যে নাই। দিবানিশি কেবল এই বিষয়ের চিন্তাই আমার মনে ধক্ ধক্ ক'রে জ্বল্‌চে। প্রাণে একদণ্ডের তরেও সোয়াস্তি নাই। তোমাদি'কে দেখে সে কথা ভুলে থাকি; আবার একলা থাক্‌লেই ঐ চিন্তা মনে উদিত হয়। ভাই দেবু, আমি আরোগ্যলাভ ক'র্‌বো কি, আমার

দেহে তো এক মুহূর্তের জন্যও সুখ নাই, তার উপর আবার মনেও কিছুমাত্র শান্তি নাই। ভগবান্ আমাকে বড়ই বিপাকে ফেলেচেন।"

আমি বলিলাম "এই জন্যেই তোমার রোগও সারচে না। আমি তোমার মনের অবস্থা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি; বুঝে বড় কষ্টও হ'চ্চে। এক জ্বর তো তোমার দেহে লেগেই আছে, তার উপর তোমাকে চিন্তা-জ্বরে ধ'রেচে। পণ্ডিতেরা বলেন, চিতার আগুন হ'তেও চিন্তার আগুন ভয়ানক। চিতা মৃতদেহকে ভস্মীভূত করে, চিন্তা জীবন্ত দেহকে পোড়ায়। তুমি এত চিন্তা ক'র্‌লে শীঘ্র সেরে উঠ্‌বে কি ক'রে? এত চিন্তা ক'র্‌লে তোমার যে অপকারই হবে। হাজার ঔষধ খেলেও যে তুমি সেরে উঠ্‌তে পার্‌বে না। ঔষধে কি ক'র্‌বে? মনের প্রসন্নতাই যে রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ!"

সত্য বলিল "ভাই দেবু, তুমি যা ব'ল্‌চো, সবই সত্য। আমিও সব বুঝি। কিন্তু বুঝেও কোন ফল হ'চ্চে না। মন কোনমতেই বাগ মান্‌চে না। সুরমা যদি আমাকে ভালবেসে থাকে, তা হ'লে তো বড় সর্ব্বনাশ হ'ল! তার অন্যস্থানে বিয়ে হ'লে সে কি সুখী হবে? তার ভাগ্যে কি পবিত্র দাম্পত্যসুখ ভোগ করা ঘট্‌বে? আমার অবর্ত্তমানে, তার অন্যস্থানে বিয়ে হবেই। হ'লে তার দশায় কি হবে ভাই? ওঃ, ওঃ, তার অবস্থা যে আমি মনেও ক'র্‌তে পাচ্চি না! চিরকালের জন্য অসুখ, চিরকালের জন্য হৃদয়ে অশান্তি, চিরকালের জন্য নরকযন্ত্রণা! হায়, ভগবন্, আমাকে কেন একজনের চিরকালের অসুখের কারণ ক'র্‌লে? আমি কি গুরুতর পাপ ক'রেছিলাম, দেব? কেন আমার ভাগ্যে এত কষ্ট লিখ্‌লে?" এই বলিতে বলিতে সত্যেন্দ্র চক্ষু নিমীলিত করিল। তাহার বিশুষ্ক গণ্ডস্থল বহিয়া দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। আমিও

অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলাম "সতু, তুমি ভগবানের উপর নির্ভর কর; তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই তোমার মনে শান্তি আনয়ন ক'র্‌বেন।"

সত্য সেইরূপ চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল এবং আমার বাক্যের কোনই উত্তর দিল না। যথাসময়ে আমি যোগমায়া ও মেজবৌদিদিকে সত্যেন্দ্রের মনের এই ভীষণ অবস্থার পরিচয় দিলাম। যোগমায়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। কিন্তু মেজবৌদিদি কথা শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন "এই জন্যেই তো ঠাকুরপো আমি বলি, মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে হওয়া ভাল নয়। আর বিয়ের কথাবার্ত্তা ক'য়েও বেশীদিন রাখ্‌তে নেই। বিয়ের কথা হ'লেই মেয়ের মন সেই পাত্রটির উপর দিনরাত প'ড়ে থাকে। তার পর পাত্রের যদি কিছু ভালমন্দ হ'য়ে যায়, তা হ'লে মেয়ের আবার অপর জায়গায় বিয়ে হয়, কেননা বিয়ে তো তার হবেই। মেয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তার মনে তত কষ্ট হয় না। দুদিন পরেই সব ভুলে যায়। কিন্তু মেয়ে যদি সেয়ানা হয়, আর পাত্রের উপর তার মন ব'সে থাকে, তা হ'লে এই রকম বিপদই ঘটে! মেয়েটার চির-কালের জন্যে মাথা খাওয়া যায়। সেদিন—সেই সুশীলার কথা শুনে, তোমরা হাস্‌ছিলে, কিন্তু আমার ভাই, তার কথা শুনে প্রাণটা যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। আমি তখনই ভাব্‌লুম, 'সুশীলার সঙ্গে যতীনের যদি কোনও গতিকে বিয়ে না হয়, তা হ'লে কি হ'বে!' তোমাকে আমি সত্যি ব'লছি, সুশীলার সঙ্গে যতীনের বিয়ে দিতে তোমরা দেরী ক'রো না। সুশীলার কপালে যদি সুখ থাকে, তবে এখন বিয়ে হ'লেও সে সুখী হবে। ভগবান্ না করুন, কিন্তু কোনরকমে যদি তার সঙ্গে যতীনের বিয়ে না হয়, তা' হলে বড় সোজা কথা হ'লো না কি?

আমার মনে হয়, আর সকলই চলে, কিন্তু মেয়েমানুষের মন নিয়ে খেলা করা চলে না। মেয়ের মন খেল্‌নার জিনিষ নয়। একজনকে ভাল-বেসে অপরকে বিয়ে করা তোমরা কি রকম মনে কর, তা ব'ল্‌তে পারি না; কিন্তু মেয়ের বেলায় সেটাকে বড় সোজা কথা মনে ক'রো না। তার চেয়ে যাকে ভালবেসেচে, তাকে বিয়ে ক'রে বরং বিধবা হওয়াও ভাল!"

গম্ভীরভাবে, আগ্রহান্বিতকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মেজ-বৌদিদি অন্যত্র গমন করিলেন! আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যের অভিপ্রায়ানুসারে আমি হরনাথ বাবুকে একবার আসিতে পত্র লিখিলাম। সত্যের পিতৃষ্বসাকেও সত্যের বর্ত্তমান অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলাম। কতিপয় দিবস পরে দুইজনেরই নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইলাম। তাঁহারা উভয়েই সত্যকে দেখিবার জন্য পলাশবনে আসি-বেন। সুরমাও সত্যকে দেখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করি-তেছে। হরনাথ বাবু যদি সুরমাকে বুঝাইয়া কাহারও নিকটে রাখিয়া আসিতে না পারেন, তবে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন। পত্রের এই মর্ম্ম অবগত হইয়া সত্য যেন আনন্দিত ও কিঞ্চিৎ আশস্ত হইল। সে মৃদুস্বরে বলিল "দেবু, সুরমা আস্‌বে শুনে আমি আনন্দিত হ'লাম। সুরমা যে কখনই সেখানে থাক্‌বে না, তা তুমি দেখ্‌তে পাবে। তার বাপের সঙ্গে সে আস্‌বেই আস্‌বে।' আমিও মনে ক'র্‌ছিলাম, সুরমা যদি একবার আস্‌তো, তো ভালই হ'তো। আমার এই আসন্ন অবস্থা দেখ্‌লে, সে নিজের মন থেকে আমার সম্বন্ধে সমস্ত আশা দূর ক'র্‌তে

সমর্থ হবে। আর আমিও তাকে বুঝিয়ে ব'লতে পার্‌বো। তুমি কি বল?"

আমি মুখে বলিলাম "তা হ'লেও হ'তে পারে।" কিন্তু মন তা বলিল না। আমি দুঃখিত মনে ভাবিলাম "বন্ধু আমার স্রোতের মুখে বালির বাঁধ বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

দুই চারি দিন পরেই সত্যের পিতৃষসা এবং সুরমা সহ হরনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরমাকে দেখিবার জন্য জননী, মেজবৌ যোগমায়া সকলেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আজ অনেকদিন পরে আমি সুরমাকে দেখিলাম। সুরমা ডাগর হইয়াছে এবং প্রায় যোগমায়ার সমবয়স্কা। কিন্তু তাহার সেই বাল্যসুলভ চাঞ্চল্য নাই। মুখখানি গম্ভীর, চালচলন গম্ভীর এবং কথাবার্ত্তাও গম্ভীর হইয়াছে। সেই আনন্দের প্রতিমা যেন একটী বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে। আমি ভাবিলাম, মাতৃশোকে এবং সত্যের এই পীড়ার সংবাদে এইরূপ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। হরনাথ বাবুর শিবিকা সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সংক্ষেপে সত্যের অবস্থা বলিয়া বহির্ব্বাটীতে বসাইলাম। যতীন তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার ও অভ্যর্থনাদি করিতে লাগিল। এদিকে অপর দুইটি শিবিকা উপস্থিত হইবামাত্র আমি সত্যের পিতৃষসার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্যাকুলভাবে সত্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম "সত্য সেইরূপই আছে, তবে এখানে এসে অবস্থা কিছু মন্দ হয় নাই, এইমাত্র; এখন বোধ করি জ্বর এসেচে আপনারা বাড়ীর ভিতরে আসুন।" এই বলিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া বলিলাম "সুরমা, তুমিও এস, দিদি।" জননীদেবী, মেজবৌ, যোগমায়া

সকলেই বহির্দ্বারের নিকট সোৎকণ্ঠ-চিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই আমি বলিলাম "মা, এই পিসীমা, এই স্থরমা; এঁদের বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল, আর সতুর কাছে এঁদের এখন নিয়ে যেও না। সতু বোধ করি ঘুমুচ্চে। আমি তাকে এঁদের আসা সংবাদ আগে দেব, তার পর এঁদের ডাক্‌বো। ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ এঁদের দেখ্‌লে তার মূর্চ্ছা হ'লেও হ'তে পারে।"

পিসীমা যেন একটু শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন "তবে আমরা এখন সতুর কাছে যাবনা। তুমি বাবা, সতুকে ব'লো, আমরা এসেচি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু আবৃত করিলেন। স্থরমা মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু দুটি ভূমির উপর স্থাপিত করিল।

জননীদেবী পিসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দিদি, ও কি কর? চোখের জল ফেল কেন? চোখের জল ফেল্‌লে অমঙ্গল হবে যে! এস, বাড়ীর ভেতর এস।" তার পর স্থরমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন "মা আমার, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হ'বে, মা? বাড়ীর ভেতর এস।" কিন্তু তিনি বলিবার আগেই মেজবৌদিদি ও যোগমায়া স্থরমার কাছে গিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল।

অনতিবিলম্বে সকলেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি ঝটিতি বহির্ব্বাটীতে হরনাথ বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। হরনাথ বাবু হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে বসিয়া তামাকু খাইতেছিলেন ও যতীনকে মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "কি বাবা, সতু কেমন আছে?" আমি বলিলাম "এখনও ওপরে যাই নাই। সতুকে ঘুমুতে দেখে নীচে নেমে এসেছিলাম। এখনও বোধ হয় ঘুমুচ্চে। পিসীমা ও স্থরমাকে এখন তার

কাছে যেতে আমি নিষেধ ক'র্লাম। আমি আগে গিয়ে আপনাদের আসা সংবাদ ব'ল্বো, তার পর আপনারা যাবেন।"

হরনাথ বাবু বলিলেন "সে বেশ কথা। হঠাৎ যাওয়াটা কিছু নয়। কোন স্নায়বিক বিকার উপস্থিত হ'লেও হ'তে পারে। আচ্ছা, একবার ব'সো তুমি, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। এথানে যে ডাক্তার দেখ্চেন তিনি কি বলেন?" আমি বলিলাম "তিনি বলেন 'রোগটি কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। তবে কিছু বলা যায় না। মনের স্ফূর্ত্তি ও স্থানের পরিবর্ত্তন গুণে সেরে উঠ্লেও উঠ্তে পারে।' "

কথা শুনিয়াই হরনাথ বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটিও আরক্ত ও অশ্রুসিক্ত হইবার উপক্রম হইল। তিনি যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল; পরে তাহা বৈঠকের উপর রাখিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি একবার ওপরে যাও, দেখ, সতু জেগেচে কি না।" আমি "যে আজ্ঞে" বলিয়া উপরের গৃহে আসিলাম।

ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, সতু জাগরিত হইয়া স্থিরভাবে শয্যায় শুইয়া আছে, আর মঙ্গলা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া নিদ্রিত। আমি বলিলাম "মঙ্গলা, ওঠ্; গদাই কোথা গেছে?" গদাই মঙ্গলার ভাই।

মঙ্গলা শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল "গদাই? এই কোথা গেল। আমাকে বল্লে 'এথানে একবার বোস, আমি আস্চি।' "

আমি বলিলাম "তা তো বেশ ব'সেছিলি, দেখ্চি! মা যে তোকে খুঁজ্ছিলেন।"

"কেন?"

আমি বলিলাম "তা কি আমি জানি? ওঁরা সব এসেচেন যে! তুই এখানে ঘুমুলে কি চলে? আর গদাইকেও কি এখন কোথাও যেতে দিতে হয়?"

মঙ্গলা সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে? পিসীমা টিসীমা এসেচেন, বুঝি?"

আমি বলিলাম "হাঁ, যা শীগ্‌গীর যা; আমি এখন এখানে ব'স্‌চি।"

মঙ্গলা তদ্দণ্ডেই উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটীয়া নীচে গেল।

সতু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে এসেচে, দেবু? কোন্ পিসীমা?

আমি বলিলাম "তোমার।"

সতু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল "কখন এলেন? কই এখানে আসেন নাই যে?"

আমি বলিলাম "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। স্থির হও, তুমি ঘুমুচ্ছিলে ব'লে স্থরমা পিসীমা কেউ ওপরে আসেন নাই। এখনই আস্‌বেন।"

"তবে স্থরমাও এসেচে! দেখ, আমি তোমায় সেদিন ব'লেছিলাম, স্থরমা নিশ্চিত আস্‌বে। হরনাথ বাবুও তো এসেচেন?"

আমি বলিলাম "হাঁ, সকলেই এসেচেন। পথশ্রমে তাঁরা বড় ক্লান্ত হ'য়েচেন, আর তুমিও ঘুমুচ্ছিলে, তাই কেউ ওপরে আসেন নাই।" আমার কথা শেষ না হইতে হইতেই, পিসীমা ও জননী সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

স্থরমা ও পিসীমাকে দেখিয়াই সত্য বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং বলিল "পিসীমা, এসেচো, এস।" এই বলিয়া পিসীমার ক্রোড়ে মাথা লুকাইল। পিসীমার গণ্ডস্থল চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। স্থরমা জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। জননী

বস্ত্রাঞ্চলে নিজ মুখ চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুরমাকে স্থির হইতে বলিলেন। আমিও ইঙ্গিতে পিসীমাকে উতলা হইতে নিষেধ করিলাম।

একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, মঙ্গলা এবং বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দ্বারের দুই পার্শ্বে মেজবৌদিদি ও যোগমায়াও বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিতেছে।

শোকের এই চিত্র দর্শন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার বোধ হইতে লাগিল। আমারও হৃদয়ের আবেগ উদ্বেলিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু আমি অতি কষ্টে তাহা সংযত করিয়া রাখিলাম।

সত্য কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া মস্তকোত্তোলন করিল এবং পিসী-মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "পিসীমা, একবার এসেচো, ভাল ক'রেচো। তোমাদি'কে দেখ্‌বার জন্যে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ ক'রছিল, এখন আমি অনেকটা ঠাণ্ডা হ'লাম। পিসীমা, দেবু আমার ভাই, আর দেবুর মা আমার মা, আমি কোন জন্মেও এঁদের ঋণ শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না।" এই বলিয়া অশ্রুনয়ন হইল।

আমি বলিলাম "তুমি কি কর সতু? ছেলেমানুষের চেয়েও বেহদ্দ হ'লে যে! স্থির হ'য়ে শোও, অত উতলা হ'চ্চ কেন? আবার মাথার যন্ত্রণা বেশী হ'বে যে!"

আমার বাক্যের প্রত্যুত্তরে সত্যেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া নিমীলিত-নেত্রে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া রহিল। পিসিমা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সহসা যোগমায়া ত্রস্তভাবে দরজার এ পাশ হইতে ও পাশে চলিয়া গেল। মেজবৌদিদিও সরিয়া গেলেন। তৎপরেই আমি জুতোর শব্দ শুনিলাম। হরনাথ বাবু আসিতে-ছেন মনে করিয়া জননীদেবীও অবগুণ্ঠিত বদনে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি বারাণ্ডায় বাহির হইয়া দেখিলাম, যতীনের সহিত হরনাথ বাবু সত্যের গৃহাভিমুখে আসিতেছেন বটে।

হরনাথ বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া সত্যের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পিসীমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সত্য তখনও নিমীলিত নয়নে স্থিরভাবে শয়ন করিয়াছিল। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল। উদ্বেগের পর অবসাদ আসিয়াছিল, তাই সত্য একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিল।

হরনাথ বাবু হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে সত্যের মস্তক স্পর্শ করিলেন। মস্তকে হাত দিবামাত্র সত্য যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া জাগরিত হইল এবং হরনাথ বাবুকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল। কিন্তু হরনাথ বাবু তাহাকে বলিলেন "তুমি উঠে বস্‌লে কেন বাবা? চুপ্‌টি ক'রে শুয়ে থাক। আমরা এসেচি, তোমার ভয় কি? আমি এসেচি, তোমার পিসীমা এসেচেন, আর সুরমাও তোমায় দেখ্‌বার জন্যে এসেচে; তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। এই বলিয়া তিনি একবার কন্যার দিকে চাহিলেন। কন্যা সত্যর পদতলের দিকে অবনত মুখে বসিয়াছিল।

তিনি তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ডাক্তার বাবু কখন এসে থাকেন, দেবু?"

আমি বলিলাম "প্রত্যহ বৈকালে, এই আস্‌বার সময় হ'য়েচে।" আমার কথা শেষ না হইতে হইতে, ডাক্তারের পাল্কী আসিয়া বহির্ব্বাটীর সম্মুখে থামিল। আমি বলিলাম "ঐ, এলেন বুঝি!"

কিয়ৎক্ষণ পরেই কেশব আসিয়া ডাক্তার বাবুর আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমি বলিলাম "তাঁকে ওপরে নিয়ে এস।" এই বলিয়া একবার পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলাম "পিসীমা, তোমরা এ ঘরে থাক্‌বে কি?"

হরনাথ বাবু বলিলেন "উনি থাক্‌লেনই বা। হানি কি? সুরমা যাবে তো একবার ওঘরে যাক্।" সুরমা আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যোগমায়া ও মেজবৌদিদি যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে গেল।

ডাক্তার বাবু আসিয়া সত্যকে যেরূপ দেখেন, সেইরূপ দেখিলেন। আমি হরনাথ বাবুর সহিত ডাক্তার বাবুর পরিচয় করিয়া দিলাম এবং পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলাম "এই পিসীমাও সতুকে দেখ্‌বার জন্যে এসেছেন।" সত্যকে দুই চারিটি উৎসাহ ও আশ্বাসসূচক বাক্য বলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু গাত্রোত্থান করিলেন এবং বহির্ব্বাটিতে আসিলেন। হরনাথ বাবু ও আমি সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পিসীমাও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একটী নিভৃতস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু, হরনাথ বাবু ও আমি বহির্ব্বাটীর বারাণ্ডায় বসিয়া সত্যের পীড়া সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলাম। হরনাথ বাবুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বাবু যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:— রোগ কঠিন হইয়াছে, কিন্তু সহসা সাংঘাতিক হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। মনের স্ফূর্ত্তি হইলে, রোগ সারিয়া উঠিতে পারে; কিছুদিন কষ্ট-ভোগ হইবে মাত্র। কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। হরনাথ বাবু চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে ও বিষণ্ণ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উঠিয়া সত্যকে দেখিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে যোগমায়া আমাকে তাহার ঘরে যাইতে নিষেধ করিল। যোগমায়া বলিল "সুরমা সত্য বাবুর সঙ্গে কি কথা কচ্চে, এখন তোমার গিয়ে কাজ নাই।"

আমি যোগমায়ার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তখন আর সে ঘরে প্রবেশ করিলাম না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাত আট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু পিসীমা, হরনাথ বাবু ও সুরমাকে দেখিয়া সত্যের মনে কোথায় স্ফূর্ত্তি হইবে, বরং তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদ ও চিন্তার ছায়াই দেখা যাইতে লাগিল। সত্য কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিত না; কেবল নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিত, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত। আমি সত্যের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম, বন্ধুবরের মনে নিশ্চিত একটা প্রলয়ের ঝড় বহিতেছে। কিন্তু শরীরের এরূপ অবস্থায় এরূপ মনোবিকার উপস্থিত হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কি করি, উপায়ান্তর না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া, একদিন সত্যকে বলিলাম "ভাই সতু, তোমাকে সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন ও অন্যমনস্ক দেখি। তুমি মাঝে মাঝে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌চো, পিসীমা, হরনাথ বাবু ও সুরমাকে দেখে তোমার মনে যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি হ'য়েচে—তা তো আমার বোধ হচ্চে না। তোমার দেহের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ফূর্ত্তির

অভাব সুলক্ষণ নহে। তোমার কিসের দুঃখ? কি জন্যে তুমি চিন্তামগ্ন হ'চ্চ? কোনও আপত্তি না থাকে, তো আমায় সব কথা খুলে বল।"

সত্য অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। সে দুই একবার কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অশ্রু ও বাষ্প আসিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিল। বন্ধুর মনঃকষ্ট দেখিয়া আমারও হৃদয় বিগলিত হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু আমি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলাম "ভাই, তোমার মনের কথা ব'ল্‌তে তোমার যদি কষ্ট হ'চ্চে, তবে সে কথা ব'লে কাজ নাই। এখন থাক্; মন যায়, অন্য সময়ে ব'ল্‌বে। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি অকারণ চিন্তা ক'রো না। চিন্তা ক'র্‌লে তোমার রোগ শীঘ্র সার্‌বে না; আর বড় কষ্টও পাবে।"

সত্যেন্দ্র আমার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল "ভাই দেবু, এ রোগ আর সার্‌বে না; আমি আর সুস্থ হ'তে পার্‌বো না। আমি মনে ক'রেছিলাম, হরনাথ বাবু, পিসীমা ও সুরমাকে দেখে আমি সুখে ও নিশ্চিন্ত মনে ইহলোক হ'তে অবসৃত হ'তে পা'র্‌বো, কিন্তু বিধাতা আমার অদৃষ্টে তা লিখেন নাই। হায়, কি কুক্ষণেই সুরমা আমাকে ও আমি সুরমাকে দেখেছিলাম, কি অশুভক্ষণেই সুরমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল, আর সুরমা তা জান্‌তে পেরেছিল! আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা যদি না হ'তো, তা হ'লে আজ আমি কত সুখী হ'তাম, বল দেখি?" বলিতে বলিতে সত্যের চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পসমাকুল হইল। আমি দেখিলাম, সেই পুরাতন কথাই বটে। কিন্তু কথাটি পুরাতন হইলেও বড়ই গুরুতর ও ভয়ানক। তৎসম্বন্ধে এই কতিপয় দিবস মধ্যে সুরমার সঙ্গে সত্যের কোনও কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি বলিলাম "সতু, তুমি এরূপ

আকুল হইও না। সুরমার সঙ্গে কি তোমার সে সম্বন্ধে কোনও কথা-বার্ত্তা হ'য়েছিল ?"

সত্যেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "হ'য়েছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রকম কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল, তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তো ব'ল্‌বে কি ?"

সত্যেন্দ্র বলিল "ভাই, তোমায় আবার ব'ল্‌বো না! তোমাকে ক'এক দিন থেকে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো মনে ক'র্‌চি, কিন্তু তোমারও অবকাশ থাকে না, আর আমারও মনের ঠিক্ নাই, তাই ব'লে উঠ্‌তে পারি নাই। দেবু, সুরমার সঙ্গে সেদিন আমার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল। হায়, কেন সুরো আমাকে তার মনের ভাব জান্‌তে দিলে ? আমি যে প্রতিমুহূর্ত্তে নরকযন্ত্রণা অনুভব ক'র্‌চি! আমার মনের অশান্তি কি ক'রে আর বিদূরিত হবে, ভাই ? মৃত্যু হ'লেও যে আমি আর শান্তি-লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো না ?"

সত্যেন্দ্র আর বলিতে পারিল না! তাহার শুষ্ক গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আমি বন্ধুর অবস্থা দর্শনে তাহাকে বলিলাম "সতু, যে কথা মনে হ'য়ে তোমার এত কষ্ট হ'চ্চে, সে কথা আর ব'লে কাজ নাই। ও সব কথা এখন থাক্। ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

সত্যেন্দ্র কথঞ্চিৎ সংযত হইয়া বলিল "দেবু, মনের আগুন আর মনে চেপে রাখ্‌তে পার্‌চি না। আমি পুড়ে ছারখার হ'চ্চি। তোমাকে আমার যন্ত্রণার কথা জানা'বো, তুমি না শুন্‌লে আমার হৃদয় আর কে শীতল ক'র্‌তে পার্‌বে ?"

আমি বলিলাম "ভাই, আমি তোমার কথা ভেবে বড়ই কাতর হ'চ্চি। যাই হো'ক্, সংযত হ'য়ে তুমি যা ব'ল্‌তে চাও, বল। আমি শুন্‌চি।"

সত্যেন্দ্র বলিল "দেবু, দেখ আমি প্রথমে মনে ক'রেছিলাম, সুরমা একবার এসময়ে আমাকে দেখে গেলে, তার পক্ষেও মঙ্গল হ'তো, আমার পক্ষেও মঙ্গল হ'তো। তাই এখানে তার আসা সংবাদ শুনে আমি বড় আহ্লাদিত হ'য়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পারছি, সে এখানে না এলেই মঙ্গল হ'তো। তোমরা সকলে সেদিন ডাক্তার বাবুর সঙ্গে নীচে গেলে পর, সুরমা আমার ঘরে এসেছিল। আমি তাকে দেখেই ব'ল্লাম 'কে? সুরমা? এস। সুরমা, তুমি তো বেশ ভাল ছিলে?' আমার প্রশ্ন শুনে সুরমা কাতরচক্ষে একবার আমার দিকে চেয়ে মস্তক অবনত ক'র্‌লে; তার পরেই তার চোখথেকে দরদর্‌ ক'রে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি বল্‌লাম 'সুরমা, তুমি এত কাতর হ'চ্চ কেন? আমি তোমাদি'কে দেখে বড় আনন্দিত হ'য়েচি। জন্ম হ'লেই মৃত্যু হয়, তার জন্যে শোক কি? আমি নিজের জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ করি না। বরং একটী কথা ভেবে আমার মনে এখন বড় আনন্দই হচ্চে। দেখ সুরো, আমার মা বাপ নাই ব'লে, আমি এর আগে আপনাকে কত হতভাগ্য মনে ক'র্‌তাম। কিন্তু এখন দেখ্‌চি তাঁরা যে আজ বেঁচে নাই, তা আমার খুব সৌভাগ্যেরই বিষয়। আমি যত ভাব্‌চি, ততই বুঝ্‌তে পার্‌চি, ভগবানের সব কার্য্যই মঙ্গলময়। আজ তাঁরা বেঁচে থাক্‌লে, তাঁদের দশায় কি হ'তো, বল দেখি? এখন এক পিসীমার কথা ভেবেই আমার যত কষ্ট হচ্চে। তিনি আমাকে পুত্র-স্নেহে লালন পালন ক'রেচেন। আমি ভিন্ন আপনার ব'ল্‌তে তাঁর এসংসারে আর কেউ নাই। তাঁর যত স্নেহ, সবই আমার উপরে ঢেলেচেন। মা যে কেমন ছিলেন, তা তো আমার স্মরণ নাই; কিন্তু পিসীমাকে দেখে মনে হয়, তিনিও বুঝি পিসীমার মত হ'তে পার্‌তেন না। আমার পিসীমা আজীবন দুঃখিনী। আমার অভাবে তাঁর

শোকের সাগর যে উছ্‌লে উঠ্‌বে, তার আর সন্দেহ কি? তোমরা তাঁর প্রতিবাসী, তোমরা তাঁকে সান্ত্বনা ক'রো।' এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। কিয়ৎক্ষণ পরে সংযত হ'য়ে বল্‌লাম 'দেখ, তুমি চিরদিন তো বাড়ীতে থাক্‌তে পাবে না, শ্বশুর বাড়ীও যেতে হবে। কিন্তু যখন তুমি শ্বশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আস্‌বে, তখন আমার পিসীমার তত্ত্ব তল্লাস নিও। তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ।' আমার কথা শুনে সুরমা বল্‌লে 'তুমি পিসীমার জন্য কিছুমাত্র ভেবো না, যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, আমি তাঁর কাছে থাক্‌বো।' এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সুরমার কণ্ঠস্বর কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌লো এবং সে হঠাৎ বারাণ্ডায় বাহির হইয়া গেল।

"ভাই দেবু, কথার ভঙ্গীতে সুরমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আমার হৃদয়ের অবস্থা যে কি প্রকার হ'লো, তা সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌চো। সুরমার অবস্থা দেখে আমার হৃদয় বড় ব্যথিত হ'লো, আমিও অশ্রু বিসর্জ্জন না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে সুরমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌লাম। সুরমা প্রথম আহ্বানের কোনও উত্তর না দেওয়াতে, আমি মনে ক'র্‌লাম হয়ত সে নীচে নেমে গেছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছ্‌তে মুছ্‌তে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লে। আমি সুরমাকে দেখে বল্‌লাম 'সুরমা, তুমি কেন এত কাতর হ'চ্চ? আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। যদি এর আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যেতো, তা হ'লে আজ তোমার শোকের ও বিপদের অবধি থাক্‌তো না। কিন্তু তোমার পিতামাতার পুণ্যে, এ বিবাহ হয় নাই। এর জন্যে আমি ভগবান্‌কে মনে মনে কত ধন্যবাদ দিচ্চি। আমি তোমাদি'কে আমার এই শেষ অবস্থায় একবার দেখ্‌তে পেয়ে বড়

সুখী হ'য়েচি। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আর দুই একদিন পরে বাড়ী যাও। তোমার বাবা তোমাকে একটী সুপাত্রে অর্পণ করুন এবং ভগবান্ তোমাদের সর্ব্ববিধায়ে মঙ্গল করুন।'

"সুরমা আমার কথা শুনে যেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হ'লো এবং বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'ল্লে 'দেখ, আমি তোমার কাছে সুপাত্র আর বিয়ের কথা শুন্‌তে আসি নি। আমি তোমাকে দেখ্‌তে এসেচি। আমার যত দিন ইচ্ছে, আমি এখানে তোমার কাছে থাক্‌বো। আর বাবার সঙ্গে এখন আমি বাড়ীও যাব না। তুমি আমাকে বাড়ী যেতে অনুরোধ ক'রো না। আর—(এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সুরমার চক্ষে জল আসিল)—আর তুমি যে একশ বার বিয়ের কথা তুল্‌চো, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয়? তুমি কি আমার মনের ভাব জান না যে, তুমি একশবার আমার বিয়ের কথা তুলে আমার হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'র্‌চো?' এই পর্য্যন্ত ব'লে সুরমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করলে।

"আমি সুরমার কথা শুনে যে কি হ'য়ে গেলাম, তা ব'ল্‌তে পারি না। বুকের ভিতর হু হু ক'রে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌লো এবং চক্ষে যেন সংসার অন্ধকারময় দেখ্‌লাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বল্‌লাম 'সুরমা, কেন তুমি আমাকে এখানে দেখ্‌তে এলে? কেন তুমি আমাকে তোমার মনের ভাব জান্‌তে দিলে? হায়, অজ্ঞান বালিকা, তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌চো না যে, তোমার কথা শুনে আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা শত গুণে বেড়ে উঠ্‌লো। সুরমা, পাষাণ-হৃদয়া, আমি এখনও তোমায় অনুনয় ক'র্‌চি, তুমি আমায় আর যন্ত্রণা দিও না। তুমি আমাকে ভুলে যাও; তুমি আমার সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাই পরিত্যাগ কর; তুমি আমাকে তোমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেল। পাগলিনি, আমার

সঙ্গে আর তোমার বিবাহ? হায়, আমি যে মৃত্যুর দ্বারে দণ্ডায়মান; আমি যে শ্মশানে চিতাশয্যায় শায়িত। শ্মশানে শবের সঙ্গে কি কখন বিবাহ হয়? যখন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার আর কোনই সম্ভাবনা নাই, আর হিন্দুর ঘরের কুমারী—তোমারও চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বার উপায় নাই—তখন সুরমা,—দেবি— আবার তোমায় অনুনয় ক'র্‌চি, তুমি একেবারে আমায় ভুলে যাও; তুমি আমাকে বিস্মৃতির জলে ডুবিয়ে ফেল এবং নিজে সুখী হও, তোমার পিতাকে সুখী কর ও এই হতভাগ্যকেও সুখে ম'র্‌তে দাও।'

"ভাই দেবু, আমি তার যে কি ব'লেছিলাম, তা আমার মনে নাই। সুরমা আমার কথা শুনে বস্ত্রাঞ্চলে মুখচক্ষু লুকিয়ে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। অত্যন্ত উত্তেজনার পর আমার অবসাদ এসেছিল। সুতরাং আমি তন্দ্রাভিভূত হ'য়ে পড়্‌লাম। অনেকক্ষণ পরে যখন জাগরিত হ'লাম, তখন দেখ্‌লাম পিসীমা ও সুরমা ব'সে আমায় বাতাস ক'র্‌চে।

"দেবু, সেই অবধি আমার মনের ভিতর আগুন জ্বল্‌চে। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘট্‌লো, দেখ্‌তে পাচ্চি। ভাইরে, আমার অদৃষ্টে সুখেও মৃত্যু নাই! বড়ই যন্ত্রণা পাচ্চি। এখন এই বিপদ্ থেকে কিরূপে মুক্ত হই, তার উপায় নির্দ্দেশ কর। আমি তো ভেবে কিছু ঠিক্ ক'র্‌তে পাচ্চি না। তোমরা সুরমাকে ভাল ক'রে বুঝাতে পার? তুমি পা'র্‌বে না। যোগমায়াকে বল, বৌদিদিকে বল। তাঁদের যত্ন চেষ্টা সফল হ'লেও হ'তে পারে। হায়, ভগবন্, কেন আমাকে এরূপ বিপাকে ফেল্‌লে!" এই বলিয়া সত্য চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিল।

আমি এই বিষম সমস্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেখান হইতে উঠি-

লাম। উঠিয়া, জননী ও মেজবৌদিদিকে সকল কথা বলিলাম। ইঁহারা যে ইতঃপূর্ব্বে সুরমার মনোভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। এক্ষণে আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন "সুরমা যখন সত্যকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রেচে, তখন তার আর অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত নয়। অন্য কোথাও বিয়ে হ'লে, তার মনে সুখ তো কিছুতেই হ'বে না; বরং কোন গুরুতর অমঙ্গল হ'লেও হ'তে পারে। তবে আমরা ভাল ক'রে তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো।" যোগমায়া সেখানে উপস্থিত ছিল, সে মেজবৌদিদিকে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল "বুঝিয়েও কোন ফল হ'বে না, দিদি। সুরমা আমাকে সব কথা খুলে ব'লেচে। সুরমা ব'ল্‌ছিল, সত্য বাবু ছাড়া, তার যদি অন্য কোথাও বিয়ে হয়, তা হ'লে সে আত্মহত্যা ক'র্‌বে। আর এই অবস্থাতেই সে সত্য বাবুকে বিয়ে ক'র্‌তে চায়।" যোগমায়ার কথা শুনিয়াই আমি চমকিত হইলাম। সুরমার এই দৃঢ় পণ ও অলৌকিক আত্মত্যাগের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আসিল। আমি ভাবিলাম, সুরমা মানবী নহেন, দেবী। আর স্ত্রীহৃদয় যে এরূপ উচ্চ ও মহৎ হইতে পারে, তাহাও আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। যাহা হউক, উপস্থিত সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইতে লাগিলাম।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ বাবু কন্যাব মনোভাব বহুদিন বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি যার পর নাই চিন্তাকুল হন। এই কারণে, তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পলাশবনে আসিতে তাদৃশ ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু সুরমার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত তাহাকে আনিতে বাধ্য হইযাছিলেন। কন্যাকে পলাশবনে না আনিলে, তিনি বিজ্ঞেবই মত কার্য্য কবিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমের প্রবল বন্যার সম্মুখে বিজ্ঞতারূপ বালির বাঁধ কোন কালেই তিষ্ঠিতে পারে না। তাই তিনি সুরমাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। সুরমা পলাশবনে আসিল; আসিয়া সত্যকে দেখিল; দেখিয়া কোথায় তাহার সহিত বিবাহিত হইবার চিন্তাটি মন হইতে একেবারে বিদূরিত করিবে, না, সেই চিন্তাকে দৃঢ় সঙ্কল্পে ও সঙ্কল্পটি কঠোর কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। এই কথা হরনাথ বাবুর কর্ণে পহুঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি সমস্তই শুনিলেন; শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন। সমগ্র সংসার যেন তাঁহার নিকট

অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু হইতে দীপ্তি অন্তর্হিত হইল; মুখমণ্ডল মেঘের আকার ধারণ করিল। অনেকক্ষণ তিনি কাহারও সহিত একটীও কথা কহিলেন না; পরে যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সজলনয়নে, বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে, নিতান্ত অসহায়ের ন্যায়, বলিয়া উঠিলেন "বাবা, দেবু, আমি এই বিপদ্ থেকে কি ক'রে মুক্ত হ'ব রে!" এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিলেন।

সুধীর, বিজ্ঞ, সুবিবেচক হরনাথ বাবুকে এইরূপে বিহ্বল হইতে দেখিয়া আমি যার পর নাই কাতর হইলাম। আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত ও সংযতচিত্ত হইতে বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং চিন্তাকুল মনে গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় আমার মুখ দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন এবং ব্যাকুলভাবে সত্যের ও আমাদের কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে নিভৃতে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি তৎসমুদায় শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন, পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "দেবু, আমি তো এর আর কিছুই উপায় দেখ্‌চি না। কন্যার যা ইচ্ছা, আমাদের এখন তাই অনুসরণ ক'র্‌তে হবে। না ক'র্‌লে, সকলকেই অধর্ম্মের ভাগী হ'তে হবে। কিন্তু সুরমাকে তোমরা ভাল ক'রে বুঝিয়েছিলে? তোমরা বুঝিয়ে যদি তাকে এই সঙ্কল্প হ'তে প্রতিনিবৃত্ত ক'র্‌তে পার, তারই চেষ্টা দেখ। তদ্ব্যতীত আমি তো আর অন্য উপায় দেখ্‌চি না।"

আমি বলিলাম "মা, মেজবৌদিদি সকলেই সুরমাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। তা'দের কথাগুলি সুরমাকে যেন শেলের মত বিঁধ্‌তে থাকে। মেজবৌদিদি ব'ল্‌ছিলেন,

সত্যকে এখন বিয়ে না ক'র্‌বার কথা সুরমাকে ব'ল্‌তে গেলেই, সুরমা ছেলেমানুষের মত কাঁদ্‌তে থাকে। সুরমা নাকি মেয়েদি'কে ব'লেচে, সত্য ভিন্ন অপরের সঙ্গে বিয়ে হ'লে, সে বাঁচ্‌বে না। সুরমার মনের অবস্থা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাচ্চে। সে সত্যের অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম ক'রেচে। ভগবান্ না করুন, কিন্তু সত্যের কোনও ভাল মন্দ হ'য়ে গেলে, পাছে তার বাপ অন্য কারুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে ফেলেন, এই তার প্রধান আশঙ্কা। সে যাই হো'ক্, এখন হরনাথ বাবুকে যেরূপ কাতর ও বিহ্বল দেখে এলাম, তাতে আমি যে তাঁকে কোনও প্রকারে আশ্বস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো, তার সম্ভাবনা নাই। আপনি এসময়ে একবার আমাদের বাড়ীতে গেলে ভাল হ'তো।"

গোস্বামী মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু বলিলেন "দেখ, সমস্যাটি বড়ই কঠিন। আমি তো কিছু উপায় দেখ্‌চি না। বিধাতার যা ইচ্ছা, তাই হবে।"

অনতিবিলম্বে গোস্বামী মহাশয় ও আমি আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, হরনাথ বাবু কন্যার গলা ধরিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতেছেন, সুরমাও কাঁদিতেছে। গৃহের মধ্যে ও বাহিরে স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা পিতাপুত্রীকে সান্ত্বনা করিবে কি, তাহারাও নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। আমি কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্যগ্রভাবে মঙ্গলাকে সত্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। মঙ্গলা বলিল "সত্য বাবু ভাল আছে, দাদাঠাকুর। যতীন তার কাছে র'য়েচে। সুরমার বাপ সুরমাকে কাছে ডেকে নিয়ে এসে এইরকম কাঁদ্‌চে। বাপও কাঁদ্‌চে, মেয়েও কাঁদ্‌চে। আমরা তো এ আর দেখ্‌তে পারি না, দাদা।"

আমাদিগকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুরমা নীরব হইল।

হরনাথ বাবুও হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন। মেয়েরা একে একে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় হরনাথ বাবুর নিকটে বসিয়া সুরমাকে বলিলেন "মা, তুমি একবার বাড়ীর মধ্যে যাও তো।" সুরমা তন্মুহূর্ত্তেই সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমিও চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করাতে, মেয়েরাও একে একে কবাটের অন্তরাল হইতে সরিয়া গেল। কেবল মেজবৌ ও মঙ্গলা কোনমতেই সেখান হইতে নড়িল না।

গৃহ শূন্য হইলে গোস্বামী মহাশয় হরনাথ বাবুকে বলিলেন "আপনি এই বিপদের সময় এরূপ অধীর হ'লে চলে? আপনি বিজ্ঞ ও প্রবীণ, একটু শান্ত ও আশ্বস্ত হউন।"

হরনাথ বাবু বলিলেন "গোস্বামী মশাই, শান্ত আর আশ্বস্ত হ'ব কি, আমি বুদ্ধিহারা হ'য়েছি। সুরমা আমার একমাত্র মেয়ে, আমার আর কোনও সন্তান নাই। সংসারে সুরমা ভিন্ন আমার আর কেউ নাই। সুরমা আমার বড় আদরের ধন। এই মায়ার সংসারে ওকে দেখেই আমি এখনও প্রাণ ধারণ ক'রে আছি। মনে ক'রেছিলাম, সুরমাকে সুপাত্রে অর্পণ ক'রে ও তাকে সুখী দেখে, আমি এই সংসার থেকে স'রে যাব। সুরমার গর্ভধারিণী ও আমি সত্যেন্দ্রকে আমাদের জামাতা ক'র্‌বো, এই সঙ্কল্প অনেক দিন থেকে ক'রেছিলাম। সতু যেরূপ ছেলে, ওর চেয়ে ভাল পাত্র সুরমার ভাগ্যে আর কোথায় জুট্‌তো? সতুর অসুখ ও আমার পত্নীবিয়োগ না হ'লে, এতদিন তার সঙ্গে সুরমার বিয়ে হ'য়ে যেতো। কিন্তু সতুর রোগ যে এরূপ কঠিন হবে ও সুরমা যে এই অবস্থায় তার সঙ্গে পরিণীত হ'তে চাবে, সে কথা আমি ভাবি নাই। মেয়ের সঙ্কল্প দেখে কোথায় আজ আমার আনন্দ হবে, না, আনন্দ ঘোর বিষাদে পরিণত হ'চ্চে। কোথায় মেয়ের সুখ দেখে আজ আমি

ইহলোক হ'তে অবসৃত হ'ব, না,তাকে আমার জন্মের মত দুঃখিনী দেখে যেতে হ'চ্চে। হায়, হায়, আমার অদৃষ্টে যে এত কষ্ট ছিল, তা আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।" এই বলিয়া হরনাথ বাবুর আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। তিনি আবার বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন হইলেন।

গোস্বামী মহাশয় হরনাথ বাবুকে বলিলেন "মুখুয্যে মশাই, শান্ত হউন। এরূপ অধীর হবেন না। আপনারা অনেকদূর এগিয়েচেন। এখন আর পেছু-পা হওয়া চলে না। মেয়েকে বুঝিয়ে আমি যদি অন্য-মত ক'র্‌তে না পারি, তবে সতুর সঙ্গেই আপনি তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত হ'ন। আর এই কার্য্যটি শীঘ্রই সম্পন্ন করুন। বিলম্ব ক'র্‌লে, অনর্থ ঘট্‌বে। আপনি মঙ্গলময় ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে, সতুর হাতে তাকে সমর্পণ করুন। কিন্তু থামুন—একবার আমি সুরমাকে দুই একটী কথা ব'লে দেখি।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বলিলেন "দেবু, সুরমাকে একবার এখানে ডাকাও।"

আমি স্বয়ং বাড়ীর মধ্যে গিয়া সুরমাকে ডাকিয়া আনিলাম। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া আবার দরজার কাছে দাঁড়াইল।

সুরমাকে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "সুরমা, তোমার বাবা বহুদিন থেকে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবার সঙ্কল্প ক'রেচেন। তোমার মারও সেইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সত্য এখন পীড়িত; পীড়িত অবস্থায় তার বিয়ে হওয়া উচিত নয়। সত্য কিছু সুস্থ হয়ে উঠ্‌লেই, তোমার বাবা তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবেন। তুমি তোমার বাবার একমাত্র মেয়ে, তোমার বিয়েতে ইনি ধুমধাম ক'র্‌বেন, আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌বেন, আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌বেন। সে সমস্ত কাজ হঠাৎ কি এখানে হ'য়ে উঠে? সত্য সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বিয়ের কথা মনেও এনো না। সত্যকে এখানে দেখ্‌তে এসেচো,

বেশ ক'রেচো। দু'দিন থেকে, তোমার বাবার সঙ্গে আবার বাড়ী যাও। সেখানে তুমি সত্যের সংবাদ রোজই পাবে। আর একটী কথা কি, জান ? যতদিন না কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়, ততদিন তার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করা উচিত নয়। সেরূপ চিন্তা করায় দোষ আছে। কেননা, যদিই কোনও প্রকারে তার সঙ্গে বিয়ে না হয়, তা হ'লে, সেরূপ চিন্তায় পাপ হয়।"

সুরমা স্বপদে দৃষ্টি নিহিত করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের এই বাক্যগুলি শুনিতেছিল। সেই সময়ে তাহার বিষাদময়ী পবিত্র মূর্ত্তিখানি অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের বাক্যের অবসান হইতে না হইতে, তাহার হৃদয়ে যেন কিসের একটা জোয়ার আসিয়া পড়িল। অমনি দরদরধারে তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। সুরমা আপনার হৃদয়ের আবেগ সংরুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া, আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয় একদৃষ্টিতে সুরমার এই বিচিত্র ভাব দেখিতেছিলেন। সুরমাকে অশ্রু বর্ষণ করিতে দেখিয়া, তাঁহারও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। সুরমা আমাদের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, তিনি বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় উঠিয়া একাকী অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বৈঠকখানায় প্রত্যাগত হইয়া হরনাথ বাবুকে বলিলেন "মশাই, সত্যের সহিত সুরমার এখন বিয়ে না হ'লে, সত্যের অবর্ত্তমানে, সুরমার অন্য কোথাও বিয়ে দিতে যদি আর সঙ্কল্প না করেন, তা হ'লে, বলুন, সুরমাকে বুঝিয়ে এখন এই বিয়ে স্থগিত রেখে দিই।"

হরনাথ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মশাই, কন্যা আজন্ম

অনূঢ়া থাক্‌বে, একি সম্ভবপর ? সমাজে যে নিন্দিত ও পতিত হ'তে হবে। আপনি সকলই তো বুঝ্‌তে পার্‌চেন।"

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "আমি সবই বুঝ্‌তে পার্‌চি। এখন তবে সব কথা ছেড়ে দিয়ে, আমার পরামর্শ শুনুন। সত্যের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ব্যতীত আমি আর কোনও উপায় দেখ্‌তে পাচ্চি না। আপনি আর কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না। চিন্তার সময় আর নাই। এখন একটী শুভদিন দেখে সত্যের সহিত স্বরমার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করুন। আমার বেশ মনে হ'চ্চে, এই পরিণয়ের ফল শুভই হবে। দেখুন, সত্যের রোগ কঠিন বটে, কিন্তু সাংঘাতিক নয়। আর আপনি যে কন্যা পেয়েচেন, তাহা কন্যারত্ন। লক্ষের মধ্যে এরূপ একটীও কন্যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আপনার কন্যার সঙ্কল্প দেখে, আজ সেই পূতচরিত্র সাবিত্রীদেবীর কথা আমার মনে হ'চ্চে। আপনার কন্যাটি যেরূপ সুশ্রী ও সুলক্ষণা, ওর অদৃষ্টে যে কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণা আছে, তা ভ্রমেও আমার মনে হয় না। আপনি এরূপ কন্যা পেয়ে ধন্য হ'য়েচেন। আপনাকে আমি নিশ্চিত ব'ল্‌চি, সাধ্বীর করস্পর্শে সত্য সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে। স্বয়ং ভগবান্ ধন্বন্তরিরও চিকিৎসা সতীর শুশ্রূষার সমান হবে না। সবই ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা। সবই তাঁর আশ্চর্য্য কাণ্ড! এরূপ মেয়েকে দেখে, আজ ধন্য হ'লাম।" এই কথা বলিতে বলিতে গোস্বামী মহাশয় অশ্রুনয়ন হইলেন। হরনাথ বাবুও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন "আপনি মহাত্মা ব্যক্তি, আপনার বাক্যই সত্য হউক।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের অভিলাষানুসারে সত্যকে দেখিবার জন্য আমরা তিন জনে তাহার গৃহে উপনীত হইলাম।

দেখিলাম, যতীন্দ্র সত্যকে ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাই-

তেছে। আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, সত্য বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্য সেদিন কিছু সুস্থ ছিল।

গোস্বামী মহাশয় সত্যের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "সত্য তোমাকে আমাদের একটী বিশেষ অনুরোধ রাখ্‌তে হবে। আমরা অনন্যোপায় হ'য়েই, তোমাকে সেই অনুরোধটি রাখ্‌তে ব'ল্‌চি। তুমি সুরমাকে বিবাহ কর। তোমার এই পীড়িত অবস্থায় তোমাকে বিবাহ ক'র্‌তে বলা আমাদের আদৌ কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু সুরমার মনোভাব বুঝে এবং সব দিক্‌ দেখে, তোমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ ক'র্‌চি। তোমার পিসীমারও অমত নাই। তুমি কোন অন্য মত ক'রো না।"

গোস্বামী মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া সত্যেন্দ্র অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল এবং চিন্তা করিতে লাগিল। পরে বলিল, "আপনাদের অনুরোধ অবহেলা করা আমার উচিত নয়, তা বুঝ্‌তে পার্‌চি। কিন্তু আপনরা তো আমার শরীরের অবস্থা দেখ্‌চেন। আমার এ যাত্রা রক্ষা পাবার কিছু উপায় আছে কি? আমায় পরমায়ুর শেষ হ'য়ে আস্‌চে। তবে আমাকে বিপদে ফেল্‌চেন কেন?"

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "তুমি শীঘ্র সেরে উঠ্‌বে, তজ্জন্য চিন্তা ক'রো না। দেবুর কাছে শুন্‌তে পাবে,আমরা অনন্যোপায় হ'য়েই তোমাকে এই অনুরোধ ক'র্‌তে এসেচি। তুমি আর কিছুই ইতস্ততঃ ক'রো না।"

সত্যেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল; পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল "আমি আর কি ব'ল্‌বো। যা' ভাল বিবেচনা হয়, আপনারা করুন।" এই বলিয়া দৌর্ব্বল্য হেতু বিছানায় শয়ন করিয়া পড়িল এবং চক্ষু নিমীলিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইল।

হরনাথ বাবু ও গোস্বামী মহাশয় সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যতীন্দ্র ও আমি সত্যের কাছে বসিয়া রহিলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্য ও সুরমার বিবাহের কথা পলাশবনে রাষ্ট্র হইল। সুরমার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল এবং অনেকে আপনাদের মধ্যে বলিতে লাগিল, সুরমা যেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী। কেহ কেহ বলিল, সত্যেন্দ্রও যেন সত্যবান্! আমি নামের মিলন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, সুরমার কখনও অমঙ্গল বা কষ্ট হইবে না। তাহাদের গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সতীর অদৃষ্টে কখনও দুঃখভোগ থাকে না। বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন ও আমোদ আহ্লাদই বা আর কি হইবে? যাহা না হইলে নয়, কেবল তাহাই অনুষ্ঠিত হইল। যে সুরমার বিবাহে তাহার পিতা সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সুরমার বিবাহে সামান্য অর্থমাত্র ব্যয়িত হইল। যে সুরমার বিবাহে, আনন্দ ও উল্লাসের স্রোত ছুটিবার কথা ছিল, সেই সুরমার বিবাহ সকলের নয়ন-বারির সহিত, সম্পন্ন হইল! সকলই ভগবানের ইচ্ছা। কন্যাদান করিবার সময়, হরনাথ বাবু চক্ষের জলে

ভাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরমার নয়নে এক বিন্দুও অশ্রু দৃষ্ট হইল না। অধিকন্তু, তাহার গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মুখমণ্ডলে যেন এক অপূর্ব্ব লাবণ্য ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন এক অপার্থিব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে লাগিল। গ্রামস্থ যে সমুদয় নরনারী বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা পট্টবস্ত্রপরিহিতা, গাম্ভীর্য্যশালিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী সুরমার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া পরস্পরে বলিতে লাগিল "সুরমা যেন সাক্ষাৎ ভগবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।" মেজবৌদিদি বলিলেন "ঠাকুরপো, সুরমার এমন রূপ আর কখনও দেখেছিলে? যেন সোণার প্রতিমা! আমি তো সুরমার দিকে চাইতে পার্‌চি না।" এই তেজঃপুঞ্জময়ী যুবতীর পার্শ্বে সত্যেন্দ্রনাথের বিশুষ্ক, মলিন দেহযষ্টি দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কোনও করুণারূপিণী দেবতা সত্যের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া ধরাতলে সহসা আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাহাকে অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন! এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি রোমাঞ্চিত হইলাম, সহসা স্থান ও কাল বিস্মৃত হইলাম এবং এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া নিমীলিতনেত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে, সুরমাকে প্রণাম করিলাম!

সুরমা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও আমার চিরপ্রণম্যা। সুরমার ন্যায় মহীয়সী নারী আমি আর কখনও কোথাও দেখি নাই। সুরমাকে দেখিয়া আমি ধন্য হইয়াছি এবং আমার হৃদয় পূর্ণ ও পবিত্র হইয়াছে। সুরমাই আমাকে পাপযুগে সত্যযুগ দেখাইয়াছে ও এই পাপ কোলাহলময় অসার সংসারক্ষেত্রে স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখাইয়াছে। সুরমাকে দেখিয়াই, আমি নারীজাতিকে হৃদয়ের সহিত সম্মান ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছি, প্রাণের মধ্যে এক অদম্য আশা ও উৎসাহ অনুভব

করিতেছি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি :—

"নারী হি জননী পুংসাং, নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্‌গেহে গৃহস্থানাং নারীপূজা গরীয়সী॥"

নারী আমাদের জননী। নারী আমাদের গৃহের লক্ষ্মী,—শ্রী। হায় হতভাগ্য আমরা, এই নারীর পূজা করি না, এই নারীর মহিমা জানি না।

একদিন সত্যেন্দ্র আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া সাশ্রুলোচনে বলিল "দেবু, সুরমা মানবী নয়, দেবী। আমি তো সুরমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক্ হ'য়েচি। আমি কি সুরমার উপযুক্ত? আমি সুরমার ছায়াস্পর্শ ক'র্‌বারও যোগ্য নই। দেখ, সুরমার পবিত্র করস্পর্শে আমার দেহের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে যেন একটী তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হ'চ্চে! আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন আনন্দ ও উল্লাসের একটী প্রবল জোয়ার এসে, আমার কণ্ঠ রুদ্ধ ক'র্‌বার উপক্রম ক'র্‌চে। মৃত তরু যেরূপ মঞ্জরিত হয়, সেইরূপ আমার এই মৃত প্রাণেও যেন আশা-পল্লব উদ্ভিন্ন হ'চ্চে এবং আমার হৃদয়ের মধ্যে উৎসাহের বহ্নি যেন প্রধূমিত হ'চ্চে! এ কিরূপ হ'চ্চে? কই, এত সুখ জীবনে তো কখনও অনুভব করি নাই? আমার সুখের পরিমাণ পূর্ণ হ'লো না কি? দীপ নির্ব্বাণ হ'বার পূর্ব্বে, একবার যেরূপ হেসে উঠে, আমার জীবন প্রদীপও তো সেইরূপ ক'র্‌চে না? আর ক'র্‌লেই বা! আমার মনে আর কোনই কষ্ট নাই। সুরমার জন্য আমার আর কোনও চিন্তা নাই। সুরমা আমার হ'য়েচে, আমি সুরমার হ'য়েচি। আমরা ধন্য হ'য়েচি। ইহাই আমাদের জীবনের সাধ ছিল।"

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রের চক্ষুর্নিমীলিত হইয়া

আসিল। তাহার শুষ্ক মলিন মুখে একটী মধুর পবিত্র হাসি দেখা দিল। আমি বন্ধুকে তন্দ্রাভিভূত মনে করিয়া সেইস্থান হইতে উঠিয়া গেলাম এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিলাম "জীবন-প্রদীপ আর নির্ব্বাণ হয়? তা হ'লে যে প্রেম, অনুরাগ, ধর্ম্ম সকলই মিথ্যা!"

বাস্তবিক বিবাহের পর হইতে সত্যেন্দ্রের অবস্থার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইল। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, যেদিন বিবাহ হইল, তাহার পরদিন হইতেই জ্বর আসা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল, এবং সত্যের দেহে স্ফূর্ত্তি ও বল দেখা যাইতে লাগিল। সাধ্বী সুরমার পবিত্র তেজের সম্মুখে, পাপ জ্বরাসুর যেন কোনমতেই আর দণ্ডায়মান হইতে পারিল না! সত্যের উপর সুরমার যত্ন, সুশ্রূষা ও সেবা যে কি অদ্ভুত কার্য্যই করিয়াছিল, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। আমার মনে হয়, সুরমার সস্নেহ করস্পর্শেই যেন রোগ জ্বালা তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া পলাইবার পথ পাইল না। সেই দেবরূপিনী, গাম্ভীর্য্যশালিনী, কঠোর-কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্না, কুসুম-কোমল-প্রাণা, বীরাঙ্গনার মূর্ত্তিখানি স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, আজিও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল অতীতপ্রায় হইল। সুরমা সত্যেন্দ্রের বিবাহের পর, একমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সত্যেন্দ্র চিন্তাজ্বর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া,সুরমার শুশ্রূষাগুণে দিন দিন রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল। তাহার দেহে একটু বলাধানও হইল। সত্যেন্দ্র এখন অবলম্বন ব্যতিরেকে চলিতে পারে, নীচে নামিয়া আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ প্রান্তরে ও বনের ধারে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পাদচালনা করিতে পারে; বসিয়া বসিয়া দুইদণ্ড কথাবার্ত্তা কহিতে পারে এবং কখনও বা দুই এক ঘণ্টা পুস্তক পাঠ করিতে পারে। গ্রামশুদ্ধ লোক সত্যের অবস্থার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দিত হইল। এরূপস্থলে, হরনাথ বাবু ও সত্যের পিতৃষ্বসার আনন্দের আর উল্লেখ না করিলেও চলে। সত্যকে একবার দেশে লইয়া যাইবার জন্য ইঁহাদের উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু ডাক্তার বাবু ইঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। সত্য যতদিন সম্পূর্ণরূপে নীরোগ না হইতেছে, ততদিন যে তাহার দেশে যাওয়া কোনমতেই

উচিত নহে, তাহা তিনি বিশেষরূপে ইঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। উপায়াভাবে, পিসীমা ও হরনাথ বাবু সত্য-স্বরমাকে কিছুদিনের জন্য পলাশবনে রাখিয়া দেশে গমন করিলেন।

শরৎ ঋতুর সমাগমে বাহ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্বশোভা হইল। আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া নির্ম্মল হইল। বায়ু শীতল ও সুখসেব্য হইল; বনরাজি প্রগাঢ় শ্যামলবর্ণ ধারণ করিল। ক্ষেত্র সকল হরিৎ শস্যে পূর্ণ হইল। স্বচ্ছ সরোবর সকল কুমুদ-কহ্লারে সুশোভিত হইয়া সাধুর নির্ম্মল হৃদয়ের উপমা-বিষয়ীভূত হইল। বনে অগণ্য আরণ্য বৃক্ষ কুসুমিত হইল। শেফালিকাপুষ্পের সৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত হইতে লাগিল। প্রাভাতিক সূর্য্যকিরণে, বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতিদল উড্ডীন হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা হইতে লাগিল। ধরণী জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইয়া যেন স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইল। আমি প্রকৃতিদেবীর এই শ্যামল, শীতল, দলমল ভাব দেখিয়া, হৃদয়ে দিব্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। অবকাশ পাইলেই, আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অদম্য উৎসাহে, বনে, নদী-তটে, শ্যামলক্ষেত্রে, প্রান্তরে ও কত রমণীয় স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। অপরাহ্নে, সত্যেন্দ্র যতীনের সমভিব্যাহারে, আমাদের গৃহের সম্মুখে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। আমিও কোন কোন দিন তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম, কিন্তু প্রভাতকালে আমি নিতান্ত বাধ্য না হইলে, কোনমতেই গৃহে থাকিতাম না। প্রভাত-সমীরের ন্যায় আমিও উদ্দামচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতাম।

আজ বহুদিন প্রকৃতিদেবীর সহিত একাত্ম হইতে সমর্থ হই নাই। আজ বহুদিন তাঁহার সহিত প্রাণের কথা বিনিময় করি নাই। সেই যে, বিবাহের পূর্ব্বে, আমি প্রকৃতিসেবক হইব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প

করিয়াছিলাম, এবং ঈশ্বর-চিন্তায়, পবিত্র-গ্রন্থ-পাঠে ও সাধুগণের পবিত্র চরিত্রালোচনায় হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতাম, বিবাহের পর, সাংসারিকতার মোহময়ী ছলনায়, জগতের পাপময় কোলাহলে এবং সত্যেন্দ্রনাথের জন্য উদ্বেগ ও চিন্তায়, আমি তৎসমুদায় যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। দুই চারি দিন প্রকৃতিদেবীর সহিত একাত্ম হইতে হইতে, সেই সমস্ত ব্যাপার হৃদয় মধ্যে পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া উঠিল। আমি আবার গম্ভীর হইতে লাগিলাম। আমি পুনর্ব্বার চিন্তামগ্ন হইলাম। উপহাস, বিদ্রূপ, আমোদ, প্রমোদ আমার নিকট অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। আমার অনুষ্ঠিত অনুচিত কার্য্যগুলির জন্য ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া আমি যে সাংসারিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, তজ্জন্য আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলাম।

সত্য আমার বিষণ্ণভাব দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইল। আমি তাহাকে বলিলাম "আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমার সেই পাঠ্যাবস্থার ভাব এখনও আমায় পরিত্যাগ করে নাই। মধ্যে মধ্যে আমি এইরূপ বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ি।" জননী, মেজবৌ, যোগমায়া সকলকেই ইহার জন্য আমায় কিছু কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হইল। জননী ও মেজবৌ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন, কেবল যোগমায়াই সন্তুষ্ট হইল না। সে মনে করিতে লাগিল, হয়ত তাহার গুণে আমি অপ্রীত হইয়াছি, হয়ত সে আমার মনের মত হইতে পারিতেছে না। আমি তাহার সমস্ত আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া বলিলাম "যোগমায়া, আমি তোমার উপর অপ্রীত হই নাই। তোমার মত স্ত্রী পেয়ে, আমি যথার্থতঃই সুখী হ'য়েচি। তুমি যেরূপ উন্নতমনা ও পবিত্র-হৃদয়া, অনেক সময় মনে করি, আমি তোমার অনুরূপ নই। তোমার উপর অপ্রীত হ'বার কোন কারণই আমি

দেখ্‌তে পাই নাই। কিন্তু আমি নিজের উপর বড়ই অপ্রীত হ'য়েচি। আমি সংসারস্রোতে ভেসে যা'বার যো হ'য়েচি। সংসারের কোলাহলে মিশে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য আকাঙ্ক্ষা সমস্তই ভুলে যেতে ব'সেচি। প্রাণের মধ্যে আবার সেই হাহাকার উঠেচে। হাহাকার উঠ্‌লে, আমি সংসার অন্ধকারময় দেখি। হৃদয় অশান্তিময় হয় এবং জগতের কোন পদার্থেই প্রাণ তৃপ্ত হয় না। যোগমায়া, আমার এখন বড় দুর্দ্দশা উপস্থিত, তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না। ভগবান্ শান্তিদাতা, তিনিই আমায় শান্তি দিবেন।"

যোগমায়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার সেই কাতর ও বিষণ্ণ মুখখানি দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কর ধারণ করিয়া বলিলাম "যোগমায়া, তুমি আমার জন্য ভেবো না। বিষাদ আমার জীবনের সহচর। বাল্যকাল হ'তে আমি এইরূপ গম্ভীর ও বিষণ্ণ। বৈরাগ্য আমার প্রকৃতিতে বিজড়িত। পরমেশ্বরকে এতদিন ভুলে ছিলাম ব'লে, আজ আমার এই মনঃকষ্ট।"

যোগমায়ার চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে বলিল "তুমি ভগবান্‌কে ভুলে থাক কেন? যা' ক'র্‌লে তোমার মনে সুখ ও শান্তি হয়, তুমি তাই কর। সংসারের জন্যে ও আমাদের জন্যে তোমায় কিছু ভাব্‌তে হ'বে না। যাই কর, আমি সর্ব্বদা তোমার সেই প্রসন্ন সদানন্দ মুখখানি দেখ্‌তে চাই। তোমার এইরকম ভাব দেখ্‌লে, আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয় না।" এই বলিয়া যোগমায়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিল।

আমি যোগমায়ার এই ভাব দেখিয়া হৃদয়ের আবেগে তাহাকে বলি-

লাম "যোগমায়া, দেবি, তুমি অনর্থক অশ্রুপাত করিও না। তোমার মঙ্গল হউক। দেবি, যখন আমি তোমার মত স্ত্রীরত্ন লাভ ক'রেচি, তখন আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। তুমি আমার অন্ধকারময় জীবনের আলোক। তুমি আমার সুপ্রবৃত্তি। তুমি আমার সুমতি। তোমাকে দেখ্‌লে, উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রের ন্যায, আমার হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে। তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে, এই কুটিল সংসারপথে আমি যে নির্ভয়ে বিচরণ ক'র্‌তে পার্‌বো, সে বিশ্বাস আমার অনেকদিন হ'য়েচে। এখন তুমি আমার প্রতি সমান অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখ্‌লেই আমি কৃতার্থ হ'ব।" এই বলিয়া আমি সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে বসাইলাম।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে গ্রামে আমাদের পুরাতন বাটী, অর্থাৎ দেবীপুর গ্রাম হইতে, একদিন প্রাতঃকালে আমাদের ভৃত্য আসিয়া বলিল যে, গ্রামের মধ্যে বিস্থচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইযাছে। দুই চারিটি লোক ইতোমধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি রোগশয্যায় শায়িত। সংবাদ শুনিয়াই আমি যার পর নাই দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। গ্রামে ভাল ডাক্তার বা কবিরাজ নাই; যে একজন হাতুড়ে ডাক্তার ছিল, সে রোগের সংবাদ শুনিয়াই, গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছে। কাহারও যৎসামান্য অসুখ হইলে, আমি কখন কখন হোমিওপ্যাথিক মতে তাহার চিকিৎসা করিতাম, কিন্তু কঠিন পীড়ায় রোগীকে সুচিৎসকেরই আশ্রয় লইতে বলিতাম। গ্রামে কোনও চিকিৎসক এবং আমিও নাই দেখিয়া, গ্রামস্থ লোকেরা ভয়বিহ্বলচিত্তে আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি সংবাদ শ্রবণমাত্র তদ্দণ্ডেই ঔষধের বাক্স লইয়া সেখানে যাইতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু জননী দেবী আসিয়া বাধা দিলেন এবং আমাকে গ্রামের মধ্যে যাইতে নিষেধ করিলেন।

আমি জননীদেবীর নিষেধে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম "মা, তুমি এরূপ কাজে কেন আমায় বাধা দাও? আমাদের গ্রামের ক'একটী লোক পীড়িত হ'য়েচে, এই কথা শুনে কি আমার চুপ্ ক'রে থাকা উচিত? আমি গিয়ে ঔষধ দিলে, একটা লোকও প্রাণ পেতে পাবে। আর তুমি যে আমায় সেখানে যেতে মানা ক'র্‌চো, আচ্ছা, একটী কথা একবার ভেবে দেখ দেখি?—মনে কর, যদি আমার নিজের এই পীড়া হয়, আর তুমি, যোগমায়া কি মেজবৌ প্রাণের ভয়ে আমার কাছে না এস,—আমাকে ঔষধ না খাওয়াও,—আমার সেবা শুশ্রূষা না কর,— তা হ'লে কি রকম হয়, বল দেখি? আমি যেমন তোমাদের, সংসারের সমস্ত লোকও তো সেইরূপ আমাদের। তোমরা আমার পীড়াতে ঐরূপ ব্যবহার ক'র্‌লে, বাবা যেমন আর কখনও তোমাদের মুখাবলোকন করেন না, সেইরূপ আমরা যদি পীড়িতের শুশ্রূষা ও বিপন্নের সহায়তা না করি, তা হ'লে আমাদের সকলের পিতা সেই অনাথবন্ধু ভগবান্‌ও কখনই আমাদের মুখাবলোকন ক'র্‌বেন না। এরূপ ক'র্‌লে কখনই ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। তুমি আমার জন্য কিছুমাত্র ভেবো না। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার কিছুই হ'বে না; আর ধর, যদিই কিছু হয়, তা হ'লেও এরূপ কাজে দেহত্যাগ করাতে পুণ্য ও আনন্দ আছে। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই হয় না; আমার যদি মৃত্যু থাকে, ঘরেই থাকি আর যেখানেই যাই, কেউ তা আট্‌কাতে পার্‌বে না। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে বাটীতে থাক। আমি এখনই দেখে আস্‌চি। সত্বর পথ্যের যোগাড় ক'রে দাও; তার যেন কিছুমাত্র কষ্ট না হয়।"

এই বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। কেশব ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া সঙ্গে চলিল। পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিতে চিরকালই তাহার আনন্দ। আমাকে যাইতে দেখিয়া, যতীনও আমার সহিত গমন

করিতে আগ্রহান্বিত হইল। আমি বলিলাম "যদি ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, তবে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে চ'লে এস।"

আমরা অনতিবিলম্বে গ্রামের ভিতর উপনীত হইলাম। দেখিলাম, ভৃত্যের কথা সত্য বটে। তিন চারিটি গৃহে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিয়াছে এবং প্রায় সাত আট ব্যক্তি পীড়িত। আমি পীড়িতদের গৃহে গিয়া তাহাদিগকে ঔষধ দিলাম এবং তাহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলাম। গৃহে গৃহে ধূনো গন্ধকাদি পোড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। আমি গ্রামে আসিয়াই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডাক্তার বাবুকে আনাইতে লোক পাঠাইলাম। তিনি যথাসময়ে আসিয়া রোগীদিগকে দেখিলেন এবং উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, যতীন ও আমি এই পীড়ার হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। যে গৃহে রোগের প্রথম উৎপত্তি হয়, সেই গৃহে উপনীত হইয়া জানিলাম, মৃত ব্যক্তির কোনও ঔদরিক পীড়া ছিল না; পরন্তু সে বেশ সুস্থ ও সবলকায় ছিল। আহারাদি সম্বন্ধেও তাহার কোন প্রকার অনিয়ম ঘটে নাই। এমত স্থলে কি কারণে যে সে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে, আমরা সেই বাটীর খিড়কী দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, এক বিজাতীয় দুর্গন্ধ আসিয়া আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আমরা নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া দেখিলাম, বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে একটী ডোবা গোময়, গোমূত্র, আবর্জ্জনা, গলিত পত্র, ও জল ইত্যাদিতে পূর্ণ হইয়া ভড়্ ভড়্ করিতেছে এবং তাহা হইতে বিষময় বাষ্প ও দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকের বায়ু-রাশিকে দূষিত করিতেছে। আমি যতীনকে বলিলাম "ভাই, আর যে কোনও কারণ থাক্, এইটি যে একটী প্রধান কারণ, তদ্বি-

ষয়ে সন্দেহ নাই। এই নরককুণ্ড হ'তেই বিসূচিকা-বিষের উৎপত্তি হ'য়েচে।" তৎপরে গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "তোমরা অন্য-স্থান থেকে শুক্‌নো মাটী এনে এই ডোবা শীঘ্র বুজিয়ে ফেল এবং পরিস্কৃত জল ব্যবহার কর ও ঘরে ধূনো গন্ধক পোড়াও।" গৃহস্থ শোকে বিহ্বল ছিল; সে যে এ সময়ে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ডোবা বুজাইবার চেষ্টা করিবে, তাহা বোধ হইল না; সুতরাং যতীন ও আমি, গ্রামস্থ অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে, সেই ডোবা বুজাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তৎপরে, সেই পল্লীর লোকেরা যে পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিত, তাহা দেখিতে গেলাম। পুষ্করিণীর ঘাটে উপনীত হইয়া দেখিলাম; অনেকগুলি লোক সেখানে স্নান করিতেছে। অপর একটী ঘাটে স্ত্রীলোকেরাও স্নান করিতেছে। ঘাটের নিকট গিয়া দেখিলাম, জলের উপরিভাগে তৈল ও গাত্রমল ভাসিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কলস পূর্ণ করিয়া সেই জল গৃহে লইয়া যাইতেছে এবং অবশ্য উদরস্থ করিয়া বিসূচিকা-বিস্তারের আরও সহায়তা করিয়া দিতেছে। পুষ্করিণীর পা'ড়ে উঠিয়া দেখিলাম, তাহা অপরিস্কৃত। তাহার নিভৃত স্থানগুলি বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এবং চারি পা'ড়েই অশুভদর্শী শূকরেরা বিষ্ঠান্বেষণে মহানন্দে ইতস্ততঃ ধাবমান। তাহাদের বিষ্ঠাও প্রায় সর্ব্বস্থানেই বিকীর্ণ। বর্ষার সময়, এই সমস্ত বিষ্ঠা ধৌত হইয়া পুষ্করিণীর জলে মিশ্রিত হয়। সেই জলই আবার পানের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া দুঃখিত মনে যতীন্দ্রকে বলিলাম "যতীন, আমাদের দেশের লোকের অবস্থা দেখ্‌চো? এখনও তা'রা কত অজ্ঞ; কত পশ্চাৎপদ! শিক্ষিতলোকের জন্য কত গুরুতর কার্য্যই র'য়েচে। কেউ কি এ সব ভেবে চিন্তে দেখে? সকলেই স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত! দায়িত্ববোধ কয়জনের আছে?" যতীন আমার কথা শুনিয়া চিন্তামগ্ন হইল।

কতিপয় স্ত্রীলোককে সেই পুষ্করিণী হইতে কলসপূর্ণ জল লইয়া যাইতে দেখিয়া, আমি তাহাদিগকে বলিলাম "তোমরা এখন এই পুকুরের জল খেও না; খেলে পীড়া হ'বে। তোমরা কোন ভাল পাতকুয়োর জল ব্যবহার করগে। পাতকুয়োর জল যেমনই হোক্, এই পুকুরের জলের চেয়ে ঢের ভাল হ'বে।" কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা আবার রোগীদিগকে দেখিলাম। কেহ ঔষধ সেবন করিয়া কিছু উপকার বোধ করিতেছে; কাহারও বা অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামের মধ্যে একস্থানে দেখিলাম, একটী আটচালায় অনেকগুলি লোক একত্র বসিয়া আছে। কেহ গল্প করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ বা পাটের নুড়ী হইতে দড়ী পাকাইতেছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে, সকলে আমাদিগকে রোগীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। আমরা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বলিলাম। তৎপরে আরও বলিতে লাগিলাম "আপনারা সকলে আপন আপন ঘরদ্বার পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখুন; বাড়ীর নিকটে কোনও দুর্গন্ধ হ'তে দিবেন না; পরিমিত আহার ক'র্‌বেন; পরিষ্কৃত জল পান ক'র্‌বেন; আর মন প্রফুল্ল রাখ্‌বার জন্য শাস্ত্র-পাঠ কিম্বা হরিসঙ্কীর্ত্তন ক'র্‌তে থাকুন। এরূপ না ক'র্‌লে রোগ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌বে। কেউ যদি ঘরদ্বার পরিষ্কৃত না করে, আপনারা জোর ক'রে তাকে তা' ক'রাবেন।"

আমার কথা শুনিয়া একটী প্রগল্‌ভ অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক বলিয়া উঠিল "কেউ, মশাই, যদি না ক'র্‌তে চায়, তো আমরা কি ক'র্‌বো? আমরা নিজের কথা ব'ল্‌তে পারি, অপরে ঘরদ্বার পরিষ্কৃত রাখ্‌বে কি না, তা' কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? আর আমাদের তা'তে গরজ কি?"

কথা শুনিয়া আমার গাত্রজালা উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম "অপরেরও ঘর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখাতেও তোমার যথেষ্ট গরজ আছে।

স্বার্থপর লোককে নিঃস্বার্থতা শেখাবার জন্যেই ভগবান্ এইরকম রোগ পাঠিয়ে দেন। তুমি নিজের ঘরটি পরিষ্কৃত রাখ্‌লে; কিন্তু তোমার প্রতিবাসীর ঘরের চারিদিকে দুর্গন্ধ ময়লা রইল। তোমার প্রতিবাসী পীড়িত হ'ল, কিন্তু তুমি ব'ল্‌তে পার কি যে, তুমি রোগ হ'তে একেবারে অব্যাহতি পাবে? কখনই না। এ রোগ সে প্রকারের নয়। একবার গ্রামে ঢুক্‌লে, যাকে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে—ধ'র্‌তে পারে। রোগ যাতে না হয়, তারই উপায় অবলম্বনের জন্য আমি এই নিয়ম পালনের কথা ব'ল্‌চি। তুমি একাকী, এই নিয়ম পালন ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না, আরও দশজন যা'তে এই নিয়ম পালন করে, তারও চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। অপর দশজন ভাল না থাক্‌লে, তুমিও ভাল থাক্‌তে পা'র্‌বে না, ইহা নিশ্চিত। নিজে ভাল থাক, অপর দশজনকেও ভাল রাখ, তবে তুমি নিজে ভাল থাক্‌তে পার্‌বে। তোমার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তোমাকে এই পরার্থপরতা অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। পরার্থপরতাই সমাজের জীবন। স্বার্থপর ব্যক্তি সমাজে বাস ক'রবার অযোগ্য।"

আমার কথা শুনিয়া যুবকটি মস্তক অবনত করিল। অপর যাহারা আমার কথা শুনিতেছিল, তাহারা আমার বাক্যের যাথার্থ্য স্বীকার করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমরা সেখান হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে ডোমপাড়া হইতে একটী অল্পবয়স্কা ডোমের মেয়ে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, আমাকে তাহার জননী ও ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ জানাইল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত তাহাদের গৃহে উপনীত হইলাম। উপনীত হইয়া দেখি, এক ভয়াবহ দৃশ্য! বালিকাটির জননী ছিন্নবস্ত্রে, ছিন্নকন্থায় ও মললিপ্তদেহে অনন্তনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছে। তাহার ভ্রাতা একটী ছিন্ন চেটাইয়ের উপর পড়িয়া অনবরত ভেদ ও বমি করিতেছে। তাহার এরূপ শক্তি নাই যে বিছানায় উঠিয়া বসে। সে ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে "মালতি, জল দে; মালতি, জল দে।" মালতি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের অন্ধকারময় কোণ হইতে একটী পিত্তলের ঘটীতে জল আনিয়া তাহার মুখে দিল। আমি মালতীকে বলিলাম "মালতি, তোদের আর কোনও জ্ঞাত কুটুম্ব এখানে নাই?" মালতী বলিল "আমার কাকারা আছে, কিন্তু মায়ের ও হীরুর বিয়ারাম

দেখে তারা এখানকে আস্‌তে চায় নাই।” আমি আবার জিজ্ঞাসা করি-লাম “তোদের ঘরে আর কোনও কাঁথা বা চেটাই নাই?” বালিকা দুঃখিত স্বরে বলিল “না; আর তো নাই। মা ঐ কাঁথায় শুয়ে ঘুমাচ্চে; (আহা, অভাগিনী এখনও জানে না যে, তাহার মা অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত!) আর হীরুকে এই চেটাইয়ে শুইয়ে রেখেচি।” আমি বলি-লাম “যতীন, হীরুকে ঘর হ’তে বা’র্ ক’র্‌তে হ’বে, কিন্তু ওকে শোয়া-বার কিছুই নাই; তুমি এক কাজ কর; আমার গায়ের এই মোটা চাদর-খানা ঐ গাছতলায় বিছাও। আমি মালতীর সাহায্যে হীরুকে বা’র ক’রে আনি।” আমার কথা শুনিয়া, কেশব তৎক্ষণাৎ ঔষধের বাক্স নামাইল এবং বলিল “আপুনি দাঁড়াও, তুমাকে কিছু ক’র্‌তে হবে না; আমি ওকে বাহির ক’রে লিয়ে আস্‌চি।” এই বলিয়া, কেশব মালতীর সাহায্যে হীরুকে ধরাধরি করিয়া বাহির করিল। আমি দেখিলাম, বেচারার শেষ অবস্থা। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়াছে। মুখ কালিমাময় হইয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে। অবস্থোচিত ঔষধ প্রয়োগ করিলাম, কিন্তু কোনই ফল ধরিল না। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সেইখানে বসিয়া তাহার চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু চিকিৎসা সফল হইল না। হীরু বাঁচিল না।

মালতী হীরুর মৃত্যু দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমরা সকলেই সেই অনাথার বিলাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। মালতীর মনে তখনও ধারণা ছিল, তাহার মা ঘুমাইতেছে। আমি অশ্রুমোচন করিতে করিতে তাহাকে বলিলাম “মালতি, তোর মাও তোকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচে; তুই আমাদের সঙ্গে আয়, আর কাঁদিস্‌নে, এদের সৎকারের উপায় ক’রে দি।” মালতী তার মাতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া শোকে অভিভূত হইল এবং মৃত জননীর নিকটে

গিয়া তাহার দেহের উপর আছাড় খাইতে লাগিল। আমরা সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না।

আমাদিগকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া এবং মালতীর ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া, তাহার কাকা আমাদের নিকটে আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম "মালতীর এই বিপদের সময় তা'কে একলা ফেলে গিয়ে, তোরা ভাল কাজ করিস নাই। এখন যা'তে মৃতদের সৎকার হয়, তার উপায় ক'রগে যা। যদি না করিস্, তোদের ভাল হ'বে না।" মালতীর কাকা করজোড়ে বলিল "আজ্ঞা, না, আমি ঘরে থাকি নাই কো, তাই আসতে পারি নাই। আমি এখনই লোকজন ডেকে আন্‌চি।" এই বলিয়া, সে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ পল্লী হইতে তাহাদের স্বজাতীয় লোকজন ডাকিয়া আনিল এবং তাহাদের সাহায্যে শবগুলি বহিয়া লইয়া গেল। মালতীকে যাইতে আমি নিষেধ করিলাম। কিন্তু আলুলায়িত কুন্তলা, বিগলিতবেশা বালিকা, মাতা ও ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

আমরা পলাশবনে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার করিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার বৈকালে রোগীদিগকে দেখিতে গেলাম। কোন রোগী আরোগ্যলাভ করিল, কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও দেবদেবীর পূজাদি হইতে লাগিল। আমরা গৃহে গৃহে গিয়া সকলকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে উপদেশ দিতে লাগিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে রোগীর সংখ্যা ও রোগের প্রকোপ কম হইতে লাগিল। সপ্তাহের মধ্যে গ্রামে আর বিসূচিকা দেখা গেল না।

সত্য আমাদের কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমারও হৃদয়ে কর্ত্তব্য-পালন-জন্য বিলক্ষণ আনন্দ হইল। আমি সত্যকে বলিলাম "ভাই, পরসেবাতে যে একটী আনন্দ আছে,

তা আর কিসেও অনুভব করা যায় না। ভগবানের নামে এই জীবনকে পরসেবায় উৎসর্গ ক'রে দিলে, তাতে যে দিব্য সুখের অধিকারী হওয়া যায়, সে সুখ আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই ক'একদিন রোগী-দের শুশ্রূষা ক'র্‌তে ক'র্‌তে, আমার মনে কতিপয় সঙ্কল্পের উদয় হ'য়েচে। আমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ্‌চি, অজ্ঞানতাই আমাদের সকল দুঃখের মূল। জনসাধারণের মধ্যেও যা'তে জ্ঞানের প্রভূত বিস্তার হয়, তার উপায় আমাকে ক'র্‌তে হ'বে। কিরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমাদ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হ'বে, তাতো আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না। কিন্তু দেখা যাক্, ভগবানের কৃপায় কি হয়। আমি এতদিন ভেবেছিলাম, ঋষিমুনিদের মত বনের মধ্যে চুপচাপ্ ব'সে, পরমেশ্বরের উপাসনা ক'র্‌লেই বুঝি প্রকৃত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চি, ব'সে ব'সে শুধু চিন্তা ক'র্‌লে কিছু হয় না। চিন্তা চাই, তার সঙ্গে কাজও চাই। নিষ্কাম কর্ম্মে অর্থাৎ কর্ত্তব্য পালনেই প্রকৃত সুখ আছে। প্রাণ এখন কাজের জন্য লালায়িত হ'য়েচে। কাজ,—কাজ—এখন এই এক চিন্তাই আমার মনোমধ্যে বলবতী। আমি আমার সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েচি। আমি মনে ক'র্‌চি, আমি এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ ক'রে, সকলে যাতে সুখে, শান্তিতে ও নীতিপথে থেকে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পারে, তার কথা ব'লে বেড়াবো। লোক-শিক্ষার জন্য রাজপুরুষেরা যে উপায় ক'রেচেন, তা বেশ ভালই হ'য়েচে। সেরূপ বিস্তৃতভাবে লোক-শিক্ষার উপায় বিধান করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। যাই হো'ক্, আমাদ্বারা যতটুকু ভাল কাজ হয়, তা আমি ক'র্‌বো।"

আমার কথা শুনিয়া সত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে বলিল "ভাই দেবু, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তুমি যেরূপ চিন্তা ক'রচো, আমারও

মনে ক'একদিন থেকে সেইরূপ চিন্তা হ'চ্চে। আমি তোমার পলাশ-বন দেখে এরূপ মুগ্ধ হয়েচি যে, এস্থান ছেড়ে আমার অন্য কোথাও যেতে মন স'র্‌চে না। সুরমা ও আমি, যতীনের সঙ্গে, সেদিন বনের মধ্যে অনেকদূর বেড়িয়ে এসেছিলাম; তোমার সিন্দূরে পাহাড়ে উঠে, সেখানে যতীনের কবিতা শুনলাম। স্থানটি দেখে, সুরমা ও আমি বড়ই প্রীত হ'য়েচি। হুগলি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এখন থাক্‌তে আমি নিষিদ্ধ হ'যেচি। সুরমার ইচ্ছা, আমরা পলাশবনেই একটী বাড়ী প্রস্তুত ক'রে, তোমাদের প্রতিবাসী হ'য়ে থাকি। তোমাদের মতন আত্মীয় ও বন্ধু আর কোথায় পাব? হরনাথ বাবু সুরমাকে কাল পত্র লিখেচেন। তিনি সুরমাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ লক্ষ টাকা দান ক'রেচেন। সুরমা আমায় ব'লছিল, এই টাকার মধ্যে সে কিছু টাকা কোনও সৎকার্য্যে ব্যয়িত ক'র্‌বে। তার ইচ্ছা, এই পলাশবনে, কিম্বা তৎ-সন্নিহিত কোনও স্থানে, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তোমাদের গ্রামে বিসূচিকা রোগের বৃত্তান্ত ও ডাক্তারের অভাবের কথা শুনে, তার মনে এই ইচ্ছা প্রবল হ'য়েচে। আর একটী বিষয়ে সে কিছু টাকা দান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে। তাহা লোকশিক্ষার সুবিধার জন্য কোনও বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে। আমি অবশ্য এই বিষয়ে কিছু টাকা দান ক'র্‌তে তাকে অনুরোধ ক'রেচি। সেও আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েচে। এদেশে বিদ্যালয়ের বড় একটা অভাব নাই বটে, কিন্তু তোমায় ব'লতে কি, আমি এই ক'এক বৎসর অধ্যাপনা ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, আমাদের বিদ্যালয় সমূহে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'তে যুবকেরা প্রকৃতরূপে বিদ্যাশিক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। যুবকেরা তোতাপাখীর মত কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ করে এবং সেই বিষয়গুলি পরীক্ষার সময় উদ্গীর্ণ ক'রে পরীক্ষাতে কোনও প্রকারে

উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। কিন্তু সেরূপ শিক্ষায় তাদের হৃদয়ের কর্ষণ বা চিন্তা-শীলতার বৃদ্ধি, কিছুই হয় না। বিশেষতঃ, বৃহৎ সহরের মধ্যে বা সন্নিকটে, বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আমার মতে আদৌ উচিত নয়। নির্জ্জন মনোরম স্থানেই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যাধ্যয়ন একটী মহতী সাধনা। গোলমাল ও কোলাহল এই সাধনার একটী প্রধান অন্তরায়। আর কৃত্রিম লোকসমাজ অপেক্ষা প্রকৃতিদেবীর বিস্তৃতক্ষেত্রে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা অধিক আছে। তোমাকে এসম্বন্ধে অধিক কথা ব'ল্‌তে হ'বে না। তুমি সকলই বুঝ্‌তে পার্‌চো। পলাশবনটি দেখে আমার বিশ্বাস হ'য়েচে, যদি এখানে একটী স্কুল স্থাপন করা যায়, আর সেই স্কুলের সংলগ্ন একটী ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে আমরা বালকদিগকে ইচ্ছামত সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতে পারি। কেবল পুস্তকপাঠ অপেক্ষা, চোখে দেখে ও কাণে শুনে তারা যে অধিকতর জ্ঞানলাভ ক'র্‌তে পা'র্‌বে, তার আর সন্দেহ কি? দেখে শুনে শিক্ষা ক'র্‌বার জন্যে পলাশবনের মত উপযুক্ত স্থান আর নাই। আমার নিজের বিষয়পত্রের যে আয় আছে, তা'তে আমি সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পার্‌বো। তোমারও তো কিছুই অভাব নাই। তোমার নিজের ভূসম্পত্তি এবং পৈত্রিক বিষয়ও আছে। তা'র উপর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হওয়াতে, তোমার আয়ের মাত্রা কিছু বেড়ে গেছে। সুতরাং তোমারও কিছু ভাব্‌না চিন্তা নাই। যতীনও এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে এখানে যোগদান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে। তা'রও পলাশবনে বাস ক'র্‌বার একান্ত ইচ্ছা। কবি-মানুষ কি না, বুঝ্‌তেই পার্‌চো। আমি যতদূর জান্‌তে পেরেচি, যতীনেরও বড় একটা অভাব নাই। এখন আমরা তিন জনে মিলে, যদি এই নূতন প্রণালীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করি এবং বালকদিগকে

প্রকৃত শিক্ষা দিতে সমর্থ হই, তা হ'লে কি রকম হয়? স্কুল থেকে অবশ্য আমরা কিছু আয়ের আশা করি। যা আয় হ'বে, সেই আয়ে আরও দুই এক জন প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও পণ্ডিত নিযুক্ত করা যেতে পারে। তুমি কি বল?"

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম "এ অতি সুন্দর প্রস্তাব, সন্দেহ নাই। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে পার্‌লে, আমারও একটী বহু-দিনের বাসনা চরিতার্থ হয়। সুরমার এই বদান্যতা তার উচ্চ চরিত্রেরই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। আমারও মনে মধ্যে মধ্যে এইরূপ চিন্তা উদিত হ'তো, কিন্তু চিন্তানুসারে একাকী কার্য্য করা অসম্ভব মনে ক'রে, আমি নিরস্ত ছিলাম। যাই হো'ক্‌, দেখ্‌চি ভগবানের ইচ্ছায় সকলই হয়। তুমি এই কার্য্যে আমাকে একজন প্রধান সহায় ব'লেই জান্‌বে। আমার এ'তে পূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ আছে। আর সুরমা যে এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ক'র্‌তে চেয়েচে, সে বিষয়ে আমি অধিক কথা আর কি ব'ল্‌বো। এ অঞ্চলের লোক তার কাছে এর জন্যে চিরকাল ঋণী হ'য়ে থাক্‌বে। তুমি আমার হ'য়ে সুরমার নিকট, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইও। সুরমা জনসাধারণের নিকট এ অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হ'য়ে থাক্‌বে। ভগবান্ তার মঙ্গল করুন।"
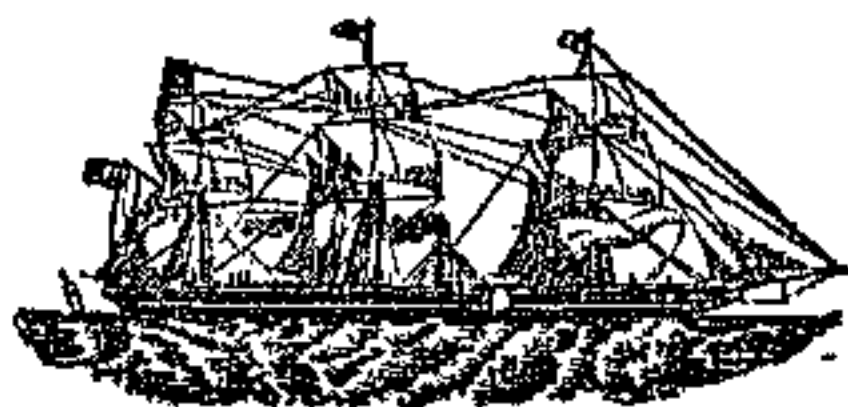
উপসংহার।

পিতৃদেব সত্য-সুরমার অদ্ভুত বিবাহের কথা পত্রে অবগত হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে, তিনি পলাশবনে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সুরমা পলাশবনের সন্নিকটে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমাদের বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি সেই কার্য্যে আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেন। সত্য পলাশবনে বাটী প্রস্তুত করিয়া আমাদের প্রতিবাসী হইবে, ইহা জানিয়া তিনি সত্য-সুরমার অভিলষিত স্থানে বাটী নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে চারিদিকেই উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে একটী অভিনব উৎসাহবহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

মেজবৌদিদির পলাশবন-ত্যাগের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু তিনি যাইবার পূর্ব্বে যতীনের সহিত সুশীলার শীঘ্র বিবাহ দিতে পিতৃ-

দেবকে সম্মত করিলেন। আর দুই মাস পরে বিবাহ হইবে, ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গেল। মেজবৌদিদি এই সংবাদ শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন "ঠাকুরপো, যতীনের সঙ্গে সুশীলার বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে গেল। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাদের বিয়ে দেখা ঘট্‌লো না। নাই ঘটুক, কিন্তু তোমরা যেন আমাদের লুচি সন্দেশের ভাগ পাঠিয়ে দিতে ভুলে যেও না। ঠাকুরপো, তোমাকে সংসারী হ'তে দেখে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী হ'য়েছি, তা ব'ল্‌তে পারি না। ঠাকুর ও মা তোমার জন্যে যে কত ভাব্‌তেন, তা তুমি জান না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরকাল সুখে থাক এবং শীগ্‌গীর সোণার চাঁদ ছেলের মুখ দেখ। আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা দুজনে অনর্থক মন ভার ক'রো না। যোগমায়ার জন্যে আমার কিছু ভাবনা নেই; তোমারই জন্যে যত ভাবনা। আমার বিশ্বাস, পুরুষেরা মেয়েদের বুঝ্‌তে পারে-না। তাই তোমার মতন পণ্ডিত লোকেও যোগমায়ার মতন স্ত্রীর উপর মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। আমি তোমাকে অনেকবার ব'লেছি, আজও ব'লে যাচ্ছি—মেয়েদের কাছে পুরুষেরা কখনই দাঁড়াতে পারে না। বিয়ের ক'নেটি তার সোয়ামীর জন্যে যে অনুরাগ দেখাতে পারে, সত্তর বছরের মিন্‌সেও তা পারে না। আর এই কথাটা একবার ভেবে দেখ না—মেয়েরাই এদেশে "সতী" হ'তো। পুরুষে তো হ'তো না। আগুনে ঝাঁপ দিতে কেবল মেয়েরাই পারে। "জহর ব্রত" ক'র্‌তে কেবল মেয়েরাই জানে। সত্তর বছরের মিন্সের আজ যদি স্ত্রী ম'রে যায়, তার চিতের আগুন নিব্‌তে না নিব্‌তেই, সে অমনি আর একটা বিয়ে ক'রে ব'স্‌বে। এই তো পুরুষের ব্যবহার। কিন্তু সুরমার কাণ্ড কারখানাটা তো দেখ্‌লে? তোমায় ব'ল্‌তে কি, ঠাকুরপো, সত্যকে বিয়ে ক'রে সুরমা আমাদের মান রেখেচে। সুরমা সত্যকে যদি বিয়ে

না ক'র্‌তো, তা হ'লে আমি তো তোমাদের সাম্‌নে আর মুখ তুল্‌তে পার্‌তুম না। যাই হো'ক্‌, আমি বড় সুখেই তোমাদের এই পলাশবনে ক'টা দিন কাটিয়েচি। তোমাদের সকলকে ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে। তোমার দাদারা তো বিদেশে বিদেশেই ঘুরে বেড়াচ্চেন। তোমার চাক্‌রী হ'লে, মা ও ঠাকুরের কাছে যে কে থাক্‌বে, তাই আমি ভাব্‌তুম। এখন ইস্কুল হ'বার প্রস্তাব হওয়াতে, পলাশবনেই তোমার থাকা হ'বে, এই কথা শুনে আমরা বড় সুখী হ'য়েচি। সকলেরই একটা না একটা কাজে লেগে থাকা ভাল। তোমার যেরূপ মন, ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল ক'র্‌বেন। আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি, তোমরা দুটীতে সুখে দিন কাটাও। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে এসো। যোগমায়ার যখন খোকা হবে, তখন যেন আমাদের ভুলে থেকো না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "এরই মধ্যে খোকার কথা কি, বৌদিদি?"

মেজবৌদিদি বলিলেন "কেন? আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে কি দোষ আছে?"

আমি বলিলাম "তা একশবার কর।"

দুই একদিন পরেই মেজবৌদিদি মেজদাদার কর্ম্মস্থলে গেলেন। পিতৃদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, আমাদের বাড়ীখানা বড়ই শূন্য ও নিরানন্দ বোধ হইতে লাগিল। জননী দুই চারি দিন কোন কার্য্যেই মন লাগাইতে পারিলেন না। যোগমায়া সুরমা এবং মঙ্গলাও অত্যন্ত দুঃখিত হইল। আমাদের কোন সহোদরা ভগিনী ছিলেন না। কিন্তু মেজবৌদিদিকে আমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তুল্য জ্ঞান করিতাম। তাঁহার পবিত্র মন, প্রশস্ত হৃদয়, উচ্চ আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, অদ্ভুত রহস্যপটুতা, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি ও সদানন্দময়ী পবিত্র মূর্ত্তি এজীবনে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

ইহার ন্যায় আনন্দময়ী মহিলার পবিত্র ছায়া যে গৃহে নিপতিত হয়, সেই গৃহই আলোক ও আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে থাকে। এই পূজ্যা দেবীকে বিদায় দিয়া, আমিও এইখানেই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

সীতা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম,-এ., বি,-এল., প্রণীত।

পূর্ণ সংস্করণ মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিদ্যালয়পাঠ্য সংস্করণ মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

"সীতা" একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা আদর্শ চরিত্রের এক খানি আদর্শ পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গবাসী।

"ইহা শুদ্ধ সীতাচরিত্রের সমালোচনা নহে। গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাষায় রামায়ণ অবলম্বন করিয়া, সীতাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য ও সুন্দর—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।" হিতবাদী।

"সীতা-চরিত্র অনেকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া কেহ বুঝি সীতা-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। গ্রন্থকার অন্য কোন্ পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার "সীতা" বাঙ্গলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। এমন সুন্দর ভাষা, ভাষার এমন তেজ, এমন প্রায় দেখা যায় না। অবিনাশ বাবু "সীতার" জন্যই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহাঁর লেখনী অক্লান্ত থাকিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি করুক, বাঙ্গালীর জন্য সুখপাঠ্য উন্নত নীতিপূর্ণ গ্রন্থ উপস্থিত করুক।" সঞ্জীবনী।

"ললনাকুলশিরোমণি সীতাদেবীর স্বর্গীয় সমুন্নত চরিত্র প্রতিফলিত করিয়া আমাদিগের এই নবীন গ্রন্থকার বাঙ্গলাসমাজের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।" নবযুগ।

"মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতময় সৃষ্টি সীতা-চরিত্র কাব্য-সংসারে দুর্লভ। পতিপ্রেমিকা সীতাদেবী সতী রমণীকুলের আদর্শ। সীতার মনোহর জীবনকাহিনী যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়াকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় চিরদিন সীতার ভুবনমোহিনী প্রেমময়ী মূর্ত্তি আলোক বিস্তার করিবে। সীতা প্রেমের অবতার; সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, সীতা শান্তির নির্ম্মল প্রস্রবণ। এ হেন সীতাচরিত্র নানাভাষায় অনুবাদিত হউক, এবং পৃথিবীর নানাদেশীয় লোকে পাঠ করুক, প্রার্থনা করি। গ্রন্থকার যে আকারে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সীতাচরিত্র বঙ্গভাষায় অদ্যাপি আর প্রকাশিত হয় নাই। পরিণয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবন-বৃত্তান্ত এ পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।" নব্যভারত।

"আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনীয় স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গলা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এজন্য অনুরোধ করা বাহুল্যমাত্র।" বামাবোধিনী।

"সূর্য্যে প্রখরতা আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু, আজন্ম কাল হইতে আমরা তাহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি তাহা পাঠ করিতেছি, তবু তাহাতে আমাদের অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহা চিরমাধুর্য্য-ময় সদানন্দদায়ক। রামায়ণের এই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে'

তাহা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বইখানি পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল, সুন্দর; বর্ণনার লালিত্য মনোহর। অধিকাংশ বর্ণনা মূল রামায়ণ হইতে অনুবাদিত। সীতার বনবাসাংশ এবং অবশেষে যজ্ঞস্থলে তাঁহার প্রাণত্যাগ অতি মনোহর ভাবে হৃদয়াদ্রকারী।"

ভারতী ও বালক।

"উপস্থিত গ্রন্থে পবিত্রতাময়ী পতিব্রতা সীতার চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল; পাঠ করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদে সময় অতিবাহিত হয়, সেইরূপ প্রভূত নীতিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পাঠে সমস্ত রামায়ণের আভাস জানিতে পারা যায়। "সীতা" অস্মদ্দেশের কুলকামিনীগণের একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ যাঁহারা পবিত্রভাবে পবিত্রতার কথা পড়িয়া আমোদিত হয়েন, তাঁহারা ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি "সীতা" পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

The Hon'ble Justice Gooroo Das Banerjea writes:—

..."*The book is written in a simple and chaste style and I read it with much pleasure.*"

Babu Tarak Bandhu Chakravarti, Deputy Inspector of Schools, Faridpur, writes:—

"(Sita) appears to be a most valuable production, calculated to help the rising generation in the formation of character."

Raja Binoya Krishna Deb of Sobhabazar Rajbati writes:—

..."Indeed it does infinite credit to you and I venture to think, it does credit to any body to write such an admirable book as you have done. I am glad to say that in my humble judgment, *your delineation of the character of Sita is highly gratifying to us all who look upon her with reverence. I only wish that the spirit you wanted your countrymen to appreciate and which you have*

so successfully depicted in the character of Sita will not be lost but have its due, and I may say, wholesome influence among us. As regards the language of the book, it is all that one can wish; for, it is quite intelligible and smooth."

Babu Bireswar Chakravarti, Assistant Inspector of Schools, Chotanagpore Division, writes:—

..."*Your excellent book the Sita. I have read the work with* great interest and can say without hesitation that it is not often that one has the pleasure of coming across, in our language, a readable work like yours. The style is chaste, simple and idiomatic, as it ought to be, and the sense is always clear and easily intelligible. The illustrations are apt and the descriptions natural and easy of conception. Withal, the work does not look like the production of a beginner and is highly fit for being used as a text-book in Bengali for the Middle Scholarship and Entrance examinations. I need hardly add that it is peculiarly gratifying to me to find you so eminently successful in your first attempt at Bengali authorship."

"Now that a controversy is going on about the desirability of introducing the Bengali language as a part of the higher University curriculum, and the dearth of good books is pointed out by the opponents of the proposal, it is both interesting and gratifying to see our young graduates take to Bengali literature, at least as a relaxation, if not as a pursuit. A very noteworthy contribution recently made from this quarter is a study of *Sita* by Babu Abinas Chandra Das, M. A. The study is based mainly on Valmiki's immortal poem, and the writer in explaining the character of his heroine has had to draw considerably from the story of the *Ramayana*; but in a close-printed volume of 228 pages he has not failed to give many instances of originality of conception and richness of style which show capacity for taking flights into the higher walks of literature, if he keeps at it. Lovable as the character of Sita is by its nature, the author's art has set up some aspects of it in a style so as to endear it all the more to the

Hindoo reader's heart. The book should form very excellent reading for females, and we should like to see it used as a text-book in the upper classes of girls' schools."—*Hope.*

"We regret we could not notice this charming Bengali work earlier. It deserves a longer review than we can here make. The style of the author is chaste, elegant, and where necessary, full of vigour. In fact considering that this is the author's first production, it is not a little remarkable that he has succeeded so well as he has done. The book would do credit to the best Bengali writers. *Sita is the ideal wife, the creation of the saintly poet* Valmiki. The writer has followed in the footsteps of Valmiki, and has attained full success in bringing out the beauties of Sita's character. He has dwelt with loving care on her love of nature in both her placid and wild aspects. In this Sita was different from the modern degraded conception of the ideal woman, who resembles rather the *caged canary than the soaring lark.* We love *to picture* Sita as the wild flower loving the breezes of her wild woodlands, Sita teaches us what conjugal love ought to be. Whilst following her husband in his exile through all perils, and sweetly obedient to his will, she seeks her husband's spiritual welfare more than to *please him in all things ; and thus we find her on several occasions* remonstrating with him on his conduct. Many are the hidden beauties in the character of Sita, which like some rare and delicate perfume pervade her nature, but escape analysis. We leave the reader to find them out, and elevate his nature with their enjoyment. The descriptions of natural scenery in the book are very vivid and charming. The author has shown *much insight into human* nature in depicting the character of Sita, and of other persons in the Ramayana, for in telling her life story, he has grouped round her life nearly all that is worth knowing in the epic. And that is one of the good features of the book. It is one of the best books *that can be placed in the hands of young ladies and old,* though, of course the male reader would be equally benefitted by it. Our countrymen, if they are sincere in their love of all that

belongs to Ancient India, ought to wellcome and cherish such a work. In its purity, its sweetness, its meek and simple heroism, its ardent love and enjoyment of Nature, its consciousness of the dignity and holiness of wifehood, and in the many other heavenly qualities which grace it, the character of Sita is unique. And this is the character the author has portrayed with consummate ability and full success."—*Indian Messenger.*

"The book is an excellent production. Whoever has once gone through it cannot but admire it. As a literary production it out beats some of the standard works on similar subjects, coming out from the pen of some of the best of our literary men. It is a valuable acquisition to the Bengali literature, and we are glad to find a concise edition of the work has been published, which is largely used in our schools, specially girls' schools......The æsthetic beauty of the work is remarkable. The description of natural scenery and of the diverse incidents and circumstances connected with the lives of the different personages specially that of Sita is so vivid that very few of those who have gone through the work can withhold shedding tears. The chief recommendation of the work is its moral beauty. The author has written the book......in the capacity of one who has been charmed by the beauty of his heroine's character. Sita is to the author the ideal female character she is to him divine female humanity, if we may be allowed to use the expression. He seemed to have been lost in and inspired by, the moral beauty of her life. The character portrayed by such an ardent admirer cannot but be of an immense moral value It must have its effects upon the readers specially those of the fair sex......We are glad to find that at a time when our men and women are forsaking genuine national ideals of moral life and are trying to make foreign ideals as the standard of their character, Babu Abinas chandra, who is a prominent M. A. of our University, has held up the character of Sita before our country. The book, on account of its own merit, has already become popular and we wish it a larger sale."—*Unity and the Minister.*

কিরূপ সুসজ্জীকৃত হইলে পরিবারে স্বর্গরাজ্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, তাহা গ্রন্থকার উপন্যাসোক্ত রমণী-চরিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার উদ্দেশ্যসাধনে বিফলমনোরথ হন নাই। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অতি মধুময় হইয়াছে। গান কয়েকটীর যেমন ভাব, তেমনই সুললিত ভাষা।"

সহচর :— "আমরা নবীনা জননী পাঠ করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখা আশানুরূপ নির্দ্দোষই হইয়াছে। এইরূপ উপন্যাস সাহিত্য-জগতের গৌরবস্বরূপ।

বঙ্গবাসী :—"(লেখকের) গ্রন্থ রচনার বেশ ক্ষমতা আছে। গ্রন্থের ছাপা ভাল, ভাষাও ভাল।"

নব্যভারত :—"এই গ্রন্থে চারিটি রমণীর দর্শন পাইয়াছি। তন্মধ্যে মলিনা স্বর্গের দেবী। গ্রন্থকার গ্রন্থ-শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'মলিনাকে আমরা ইহজীবনে সুখী দেখিতে পাইলাম না।' সমালোচক বলিতেছেন,স্বর্গে তাঁহাকে রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে পাইবেন'; শত সহস্র অপ্সরা তাঁহাকে চামর-ব্যজন করিতেছেন।"

বামাবোধিনী :—"নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। লেখক মানবপ্রকৃতির অতি গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার পরস্পর বিরোধী অসংখ্য ভাব, অসংখ্য বাসনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অতি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে সেগুলি চিত্রিত করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের যত আদর হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।"

The Hindoo Patriot says:—"An elegant little novel, which may be safely recommended to the fiction-reading public, particularly its woman kind. Some ideal characters are set up which are skilfully delineated and in which love of God and love of man are brought out in a manner, calculated to serve as exemplary types."

The Indian Mirror says:—"Altogether a superior effort—a genuine work of feeling and talent. His chaste chapters teem with a thousand flashes of brilliant wit and clever fancy. The author seems to be a practised hand in sketching characters, wonderfully life-like and full of force and grace."

The Indian Messenger, says:—"Character painting seems to be the author's *forte*. His female characters all live in our memory, as if we had met them somewhere. They are living creatures. His girls are noble, lovable creatures, with each a special beauty of her own. We do not say that a mist has not sometimes come over our eyes without reading his book, but we have smiled and laughed over his pages oftener than we have wiped our eyes. The writer is a humorist. The poems interspersed in the book have in them the ring of genuine poetry."

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।